গণবিজ্ঞান ভাবনার পত্রিকা

বিজ্ঞান অন্বেষক

BIGYAN ANNESWAK

ISSN 2582-5674

বর্ষ -১৯ সংখ্যা-৪ জুলাই - আগস্ট ২০২২ RNI : WBBEN/2003/11192 মূল্য : ২০ টাকা

সূচি

২ একজন সহজিয়া বিজ্ঞানী
জগন্নাথ মজুমদার

৫ মাকড়সার বিচিত্র শিকারকৌশল
গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

৬ এক অচিরাচরিত বিজ্ঞানী
সুমিত্রা চৌধুরী

৮ প্রকৃতিবিজ্ঞানী গোপালচন্দ্রকে স্মরণ
সিদ্ধার্থ জোয়ারদার

৯ সম্পাদক গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
অপরাজিত বসু

১০ প্রকৃতিবিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের অন্তর্নিহিত মানসলোক
দীপক কুমার দাঁ

১২ বৃক্ষ সম্রাটের গর্বিত ভুবন
কৌশিক রায়

১৩ ওলকপি

৩০ অ্যালিগেটর গার
সৌম্যকান্তি জানা

১৪ ছন্দ পতনেও ছিলেন ছন্দে
তপন দাস

১৬ সংবাদ : বিশ্বপরিবেশ দিবস

২৯ সংবাদ : রাইনোপ্লাস্টি

১৮ ব্রেইন ফ্রীজ
বিশ্বজিৎ পাল

২০ নিকোলা টেসলা
অসিত ঘোষ

২৩ কিউবার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা
প্রবীর বসু

২৪ **কবিতা**
সুব্রত রুদ্র
নির্মাল্য দাশগুপ্ত
দ্বিজেন আচার্য
জগন্নাথ মজুমদার
চন্দ্রশেখর ঘোষ
অমর ঘোষ

২৬ মিউটেশনের জন্য
অমিতাভ চক্রবর্তী

২৭ পুরনো বই রঙে বাড়ে
অনিন্দ্য দে

২৮ ছেলের জন্য শিশুবলি
ভবানীপ্রসাদ সাহু

৩২ সৃষ্টি ও ধ্বংসের নেপথ্যে
পল্লব রায় গুপ্ত

৪র্থ প্রচ্ছদ
যারা হারিয়ে যাচ্ছে
রাজা রাউত

বিজ্ঞান অন্বেষক

সম্পাদক

তাপস মজুমদার

সম্পাদকমণ্ডলী

জয়দেব দে, বিজয় সরকার, শিবপ্রসাদ সরদার, জগন্ময় মজুমদার, অমিতাভ চক্রবর্তী, অনিন্দ্য দে, রতন দেবনাথ, পান্না মানি, অনুপ হালদার, সুবিনয় পাল, প্রবীর বসু, সৌরভ মুখার্জী

: website :

www.bigyananneswakpra.in

: e-mail :

bigyanannesak1993@gmail.com.

: Whatsapp No. :

9874778216 / 9143264159/7980121478

প্রচ্ছদ বিন্যাস অঙ্গসজ্জা

তাপস মজুমদার

অঙ্কন

বিজন কুণ্ডু

সুভাষিতম্

‘যে সম্মান হৃদয়ের শত রক্তবিন্দুর বিনিময়ে ক্রীত, ওহে মহাশয়, কোনও অনুগ্রহের আশায় তাকে দারোয়ানের নিকট বিক্রয় করিও না।’

—রামমোহন রায়

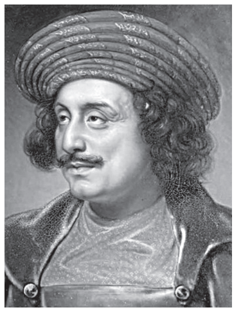

আমাদের কথা

দরজাটা খুলে রাখো

ভালোবাসা কারে কয়? ভালোবাসার রকমফের আছে? বোধহয় আছে। বেশিরভাগ মানুষ নিজেকে নিয়েই ভাবেন। নিজেকেই ভালোবাসেন। নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-সুবিধার দিকে তার অতন্দ্র নজর। এদের মধ্যে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ নিজের প্রতি ভালোবাসায় অনেকটাই নির্মম। তার স্বার্থে, তার লাভের দখলদারির জন্য সবকিছু ধ্বংস করতে তারা উদ্যত। তার জীবনদায়ী প্রকৃতিকে সে শোষণ করবে। যে বাস্তুতন্ত্রের জন্য তার জীবন, তার চলাফেরা, সেই বাস্তুতন্ত্রের মূল সে উৎপাটন করবে। সে অরণ্য নির্মূল করবে। জলাশয় বুজিয়ে দেবে। অনবরত গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গত করবে। এত সব করেও কোনো কিছুতেই তার কিছু আসবে যাবে না। কারণ সে যে নিজেকে ভীষণ ভালোবাসে। এটা একরকম ভালোবাসা। অন্যরকম ভালোবাসা কি নেই? আছে। কিন্তু তাদের বোধহয় দূরবীনে দেখতে হবে। তাদের ক্ষীণ কণ্ঠে তারা বলতে পারেন অমোঘ সত্যটা। তারা বলেন আমাদের অস্তিত্বই শুধু নয়, সমগ্র জীবকূলের অস্তিত্ব টিকে আছে পরস্পরের ক্রীড়ায় বাস্তুতন্ত্রের অমোঘ নিয়মে। একাকী কোনো জীব পৃথিবীতে থাকতে পারবে না। যদি সে জীব শ্রেষ্ঠ বুদ্ধির অধিকারীও হয়, তাহলেও সে মুছে যাবে। পরবর্তী প্রজন্মের জন্য কিছুই সে রাখতে পারবে না। তাই এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একমাত্র প্রাণময় পৃথিবীকে টিকিয়ে রাখতে তাকে ভালোবাসতে হবে। তার জীবকূলকে ভালোবাসতে হবে। ভালোবাসতে হবে ক্ষুদ্রকায় শৈবালকে। জড়িয়ে ধরতে হবে বিশালাকার বৃক্ষকে। বৃক্ষের আশ্রয়ে বসবাসকারী পাখিদের, সরীসৃপদের। ভালোবাসা ছড়িয়ে দিতে হবে ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল জীবদের। যেমন পরিবেশ কর্মী এক বন্ধু তার দেহে বসা পিঁপড়েকে সযত্নে পরিবেশে ফিরিয়ে দেন, তেমনভাবে ভালোবাসতে হবে। কিন্তু তাদের ভালোবাসতে হলে তাদেরকে জানতেও হবে। আমরা আমাদের পারিপার্শ্বিক জীবদের কতটুকু চিনি? কতটুকু জানি? এক্ষেত্রে গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য আমাদের আদর্শ। তিনি জীবনের সবটুকু ভালোবাসায় অজানা কীটপতঙ্গ, হরেক রকম মাছ, কতরকমের পাখিদের পর্যবেক্ষণ করলেন এবং আমাদের জানালেন। তিনি প্রকৃতির দরজাটা খুলে রেখেছিলেন। আমাদের প্রলুব্ধ করেছিলেন তার মধ্যে দিয়ে চলাচল করতে। এই দুঃসময়ে যখন ‘ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা’ তখন তার জন্মের ১২৫ বছর পেরিয়ে গোপালচন্দ্রের প্রকৃতিপ্রেম আরও বেশি প্রাসঙ্গিক। প্রয়োজন হয়ে পড়েছে দরজাটা খুলে রাখা।

—তাপস মজুমদার

ISSN 2582-5674

বিজ্ঞান অন্বেষকের পক্ষে জয়দেব দে, ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর) পোঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক প্রকাশিত এবং স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পোঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।

অক্ষর বিন্যাস : রেজ ডট কম, ৪৪/১এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

যোগাযোগ : ৯৮৭৪৭৭৮২১৬/৯৪৭৪৩০০৯২/৯২৩১৫৪৫১৯১/৯৪৩২৩৩৫৮৮২

প্রচ্ছদ কথা-১

জ গ ন্ম য় ম জু ম দা র

একজন সহজিয়া বিজ্ঞানী : গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

রবার্ট ব্রুসের গল্পটা আমরা সবাই জানি। সেই যে মাকড়সার জাল বুনবার গল্প। বুনতে বুনতে বারবার পড়ে যাওয়া আর ওঠার গল্প। মাকড়সার অধ্যবসায় বারবার যুদ্ধে হেরে যাওয়া স্কটল্যান্ডের রাজা রবার্ট ব্রুসের বুকে উস্‌কে দিয়েছিল নতুন এক প্রেরণার শিখা। এই গল্প এখন ক্লিশে হয়ে গেছে। কিন্তু মাকড়সা যে অন্য এক, অন্যরকম রবার্ট ব্রুসেরও প্রেরণার উৎস, কে জানত। কেন না তাঁকেও তো অজস্র প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয়েছে সমস্ত জীবনভর। তাঁর বিজ্ঞানী হয়ে ওঠার যাত্রাপথে কত না লাঞ্ছনা, উপেক্ষা সহ্য করতে হয়েছে। তিনি আর কেউ নন, এই বাংলারই আপনজন, প্রকৃতির নিতান্ত স্বজন—গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য। তিনিই প্রথম বললেন মাকড়সার অনেক ধরন—স্থলচর, জলচর এবং উভচর, এমনকি ডুবুরি মাকড়সাও আছে। সবচেয়ে বড় কথা সব মাকড়সা আবার জালও বোনে না। যদি বোনে, তারও ধরন আলাদা, কেউ খাঁড়া ভাবে, কেউ বোনে শয়ান ভাবে। কারো জাল আবার তিন কোণা, কারো চার, কারো বা বহুকৌণিক। না এখানেই শেষ নয়, কোনো জাল তাঁবুর মতন, কারো বা পাতলা কাগজের মতো সমতল।

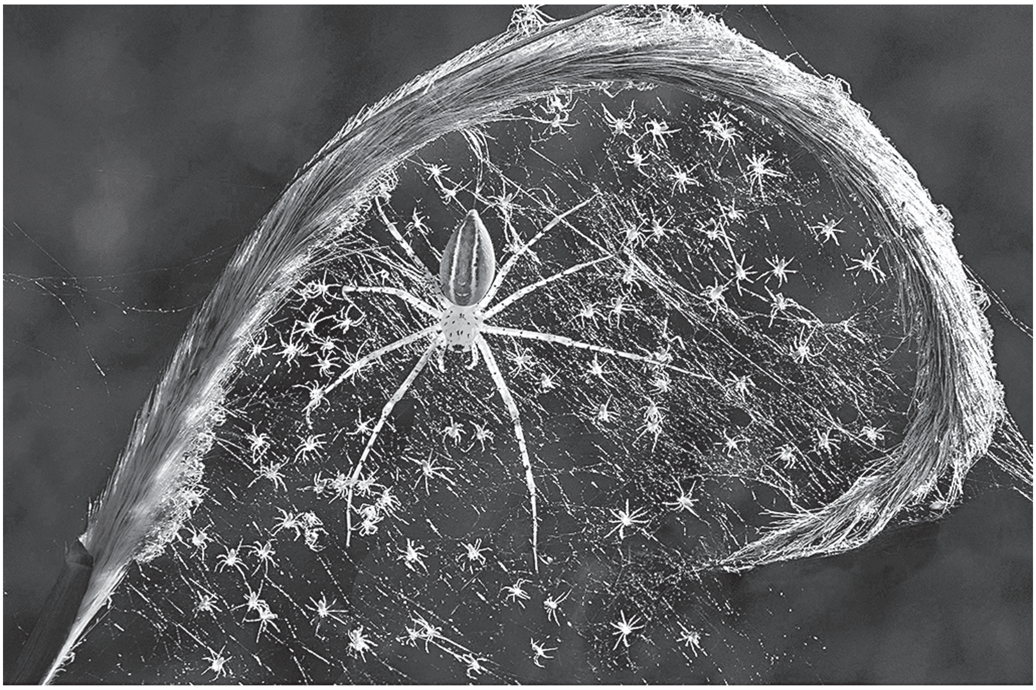

ছবি : আরনাল্ডো পাউলো চি

মাকড়সা তো আমরা সবাই দেখি। কিন্তু ক'জন জানি মাকড়সা ভীষণ অসামাজিক, একা থাকতেই ভালোবাসে। যদিও কিছু ব্যতিক্রম আছে। কেউ আবার দারুণ মিমিক্রি জানে। পিঁপড়ের দলে ভিড়ে পিঁপড়ের ছদ্মবেশে চুরি করে আনে পিঁপড়ের ডিম। আনন্দে নাচও করে। ডিম নিয়ে পারস্পরিক যুদ্ধ তো করেই। কিছু মাকড়সা আবার কাঁকড়ার মতো সামনে নয়, পেছনে নয়, পাশের দিকে হাঁটে। কি অসম্ভব নিপুণ পর্যবেক্ষক ছিলেন গোপালচন্দ্র ভাবলে অবাক হতে হয়। এসবই আমরা জেনেছি তার গবেষণালব্ধ বই 'বাংলার মাকড়সা' (১৯৪৮) থেকে। বাংলাদেশের ফরিদপুরে জন্ম (১.৮.১৮৯৫)। স্বশিক্ষিত বলতে যা বোঝায় একদম নিজের চেষ্টায় অজানাকে জানার কৌতূহল ও আগ্রহে, অনেক 'বাধার বিন্ধ্যাচল' পেরিয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন একজন প্রকৃত প্রকৃতি বিজ্ঞানী। যার সঙ্গে তুলনা চলে কেবল ডারউইন, কিংবা জাঁ অ্যাঁরি ফ্যাবার অথবা ওজিন মারের। কথাটা আমার নয়, বলেছেন আরেক প্রকৃতি বিজ্ঞানী রতনলাল ব্রহ্মচারী।

জীবদ্দশায় কি না শিখেছেন তিনি। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ। সরকারি আর্ট কলেজ থেকে ছবি আঁকা, ফটো তোলা, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সারাই-এর কাজ, লেদ মেশিনের ব্যবহার—ইত্যাদি শেখার পরেও চোখ-কান অবিরত খোলা রেখেছেন প্রকৃতির সত্যিকার প্রকৃতি জানার জন্য। ঘুরে ফিরেছেন বাংলার মাঠ-ঘাট, নদী-নালা, ঝোপঝাড়। কেবল মাকড়সার জীবন দেখা নয়, দেখেছেন পিঁপড়ে, মৌমাছি, কুমরে পোকা, প্রজাপতি, নেউলে

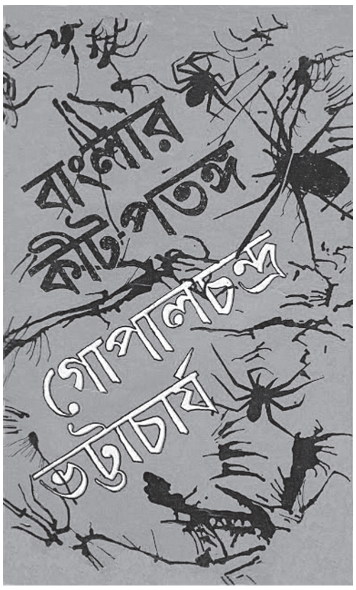

পোকা, পঙ্গপাল, কাচপোকার বিচিত্র জীবনাচরণ—স্বভাবের স্বকীয়তা। বলাবাহুল্য যখন তিনি এসব কর্মকাণ্ডে নিজেকে মগ্ন রেখেছেন তখন বাকি পৃথিবীতে এসবের কোনো গবেষণা হয়নি বলা চলে। সুতরাং এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন এদেশে পথিকৃৎ। কিন্তু পরাধীন দেশের একজন একাকী মানুষের এই গবেষণা মূল্য পায় না। তার লেখাগুলির যোগ্য অনুবাদ না হওয়াও একটি কারণ হতে পারে। সেই অর্থে তিনি তেমন কিছুই পাননি। যদিও জীবনের প্রান্তে এসে ১৯৭৫-এ তাঁর লেখা 'বাংলার কীটপতঙ্গ' রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছিল। কিন্তু পাওয়া না পাওয়া সমান। তখন তাঁর বয়স ৮১ বছর। আর মাত্র কয়েকটি বছর তিনি বেঁচেছিলেন। কিন্তু পুরস্কার আর সত্যিকার স্বীকৃতি বোধ করি এক নয়। যদিও তিনি জীবনের প্রধান সময়কাল কাটিয়েছেন কলকাতার 'বসু বিজ্ঞান মন্দির'-এ—একজন ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্টের ভূমিকায়, তাঁর

তখন (১৯২০) বসু বিজ্ঞান মন্দির

অধিকাংশ গবেষণার কাজও এখানেই, তবু তিনি ছিলেন উপেক্ষিত, ব্রাত্য। অথচ আশ্চর্য এই বসু বিজ্ঞান মন্দিরের 'Transaction'-এ ১৯৪৩-এ তাঁর একটি পিঁপড়ে সংক্রান্ত গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। আরো আশ্চর্য ও দুঃখের এই যে তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'The Ants'—যা কিনা 'পিঁপড়ে বিশারদের বাইবেল' হিসেবে চিহ্নিত (হোয়েলডবলার ও উইলসন)—সেখানে হাজার তিনেক গবেষণাপত্রের উল্লেখ থাকলেও সেখানেও গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের নাম ছিল না।

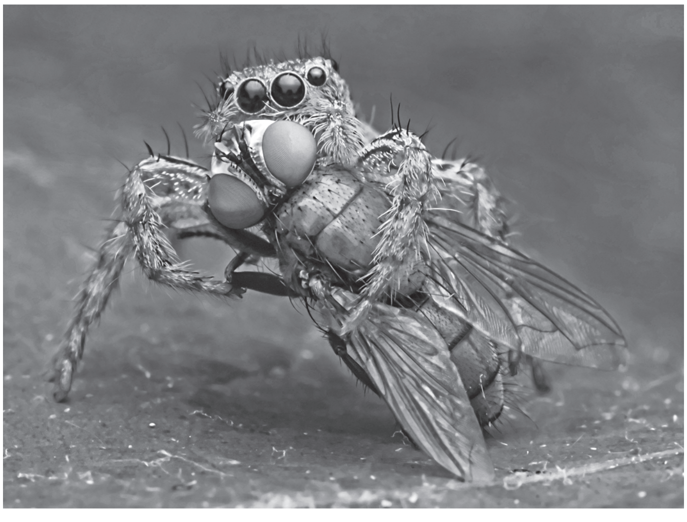

মাকড়সার মাছি শিকার ছবি : টমি টে

কারণ আর কিছু না, বিজ্ঞান মন্দিরের এই 'ট্রানসাকশান' 'সাধারণত অপরিচিত আজকের বিশ্বে'। হয়তো এটাই সর্বৈব সত্যি নয়, বিজ্ঞানী রতনলাল ব্রহ্মচারী সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, 'তবে কি একটা 'কালার বার' (Colour bar) এখানেও কাজ করছে? হয়তো অবচেতন মনে?' কথার মানুষ ছিলেন না তিনি, শ্রমিক মৌমাছির মতো ছিলেন কাজের মানুষ। উপরন্তু প্রচার বিমুখ।

আপাত দৃষ্টিতে তার কাজ, অনেকে হয়তো ভাবে, এ তো কাজ নয়, অকাজ। বনেবাদাড়ে একজন মানুষ যেন ক্ষ্যাপার মতো নিরন্তর খুঁজে ফিরছেন পরশপাথর। না তার পাথর তো অন্য কিছু, জ্যান্ত মাকড়সা ছাড়াও অন্যান্য কীতপতঙ্গ। শুধু তো সংগ্রহের জন্য খুঁজে ফেরা নয়। তিনি জানতে চান তাদের স্বভাব-চরিত্র, শিকার ধরবার কূট কৌশল, প্রজনন পদ্ধতি। সুতরাং উপর উপর দেখা নয়, একদম হাতেকলমে, রীতিমতো নিজের মতন করে, শিশুর মতন পালন করে যাকে বলে পর্যবেক্ষণ—এবং এর জন্য যে কঠোর পরিশ্রম সব তিনি সহ্য করেছেন। তাঁর একটি রচনা থেকে প্রমাণ মেলে, 'এক সময়ে পরীক্ষাগারে কয়েকটা জাল বোনা মাকড়সা পুষেছিলাম। চার ফুট চৌকো কাঠের ফ্রেমে তারা জাল বুনে শিকারের প্রতীক্ষায় বসে থাকত। রোজ দু'-একটা করে জ্যান্ত ফড়িং তাদের জালে ফেলে দিতাম... জালে আটকে গিয়ে ফড়িংটা পালাবার জন্যে ভয়ানক ঝাপটা-ঝাপটি শুরু করে দিল... ইতিমধ্যে মাঝারি গোছের একটি টিকটিকি দেয়ালের গা বেয়ে ছুটে এসেই ফড়িংটাকে লক্ষ্য করে লাফিয়ে পড়ল। ...জালের বাঁধন ছাড়াবার জন্যে টিকটিকিটা অনেকক্ষণ অবধি ধস্তাধ্বস্তি করে অবশেষে চুপ করে রইল। কিছুক্ষণ বাদেই দেখলাম মাকড়সাটা এক-পা দু'-পা করে অতি সন্তর্পণে টিকটিকিটার দিকে এগিয়ে আসছে... এগিয়ে এসে হঠাৎ টিকটিকিটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং শরীরের পেছন দিক থেকে ফিতের মতো চওড়া সুতোর ফালি বের করে পিছনের দু' পায়ের সাহায্যে টিকটিকিটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ব্যান্ডেজের মতো করে জড়াতে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ব্যান্ডেজ করা শেষ হয়ে গেল এবং সেটাকে জালে ঝুলিয়ে রেখে জালের মধ্যিখানে নিয়ে কয়েকবার

কর্মব্যস্ত শ্রমিক পিঁপড়েরা

অপূর্ব ভঙ্গিতে নৃত্য করে চুপ করে বসে রইল। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক বাদে এসে ব্যান্ডেজের পুঁটলিটার মধ্যে দাঁত ফুটিয়ে শিকারের রস-রক্ত চুষে খেতে শুরু করে দিল।'

অথবা অন্যত্র লিখেছেন 'পিঁপড়ে মাকড়সাটাকে সেদিনের মতো টিউবে করে ল্যাবরেটরিতে রেখে দিলাম। পরের দিন গিয়ে দেখি একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটেছে। টিউবের মধ্যে আগের দিনের সেই মাকড়সাটি নেই। রয়েছে সম্পূর্ণ নতুন রকমের অদ্ভুতদর্শন একটা প্রাণী। ...কোথা থেকে কেমন করে এটা টিউবের মধ্যে আসল আর আগের মাকড়সাটাই বা কোথায়, কিছুই স্থির করা সম্ভব হল না... মাকড়সাটা যেখানে ধরা পড়েছিল সেখানটায় জোর অনুসন্ধান চালাতে লাগলাম। ...অনেক দিনের চেষ্টায় গুটিকয়েক লাল মাকড়সা ধরে এনে বড় কাচের ঘরে স্বাভাবিক পরিবেষ্টনীর মধ্যে পুষতে আরম্ভ করলাম। প্রায় বছর তিনেক পোষবার ফলে এদের জীবনযাত্রা প্রণালীর অনেক রহস্যই জানা সম্ভব হয়েছে।

ভাবা যায়! প্রায় টানা তিন বছর পুষবার পর তিনি জানতে পেরেছিলেন পিঁপড়ের জীবন প্রণালী। একে কি বলব, রবিঠাকুরের ভাষায় 'সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো'—না কি স্রেফ ঘরোয়া ভাষায় বলব, বিজ্ঞানী? আসলে গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য ইজ ইক্যুয়াল টু ঐ তিনজন-ই।

কিন্তু শুষ্কং কাষ্ঠং বইবন্দি থিয়োরি শৃঙ্খলিত বিজ্ঞানী তিনি নন, ছিলেন না তথাকথিত অ্যাকাডেমিক। কীটপতঙ্গ সংগ্রহ করে তার গণ ও প্রজাতি চিহ্নিত করে, ক্যারোলাস লিনিয়াস মেনে নামকরণেই সীমাবদ্ধ ছিল না তাঁর কাজ। তিনি এদের গোপন আস্তানায় নিজে গিয়ে—সেটা হতে পারে কোনো জঙ্গল বা গর্ত, বদ্ধ মজাপুকুর, কোনো গোয়াল ঘর, দরমার ঘরের চালের বাখারি কিংবা কোনো বাগানের অকিঞ্চিৎকর বেড়ার ফাঁক। তার পকেটে, তার সঙ্গে সব সময়ই থাকত পোকা ধরবার জাল, টেস্ট টিউব এবং ফরমালিন। পরের মুখে ঝাল খেয়ে নয়, নিজের চোখে দেখে, পরীক্ষা করে অবশেষে তা তিনি লিখে রাখতেন তাঁর নিজস্ব নোটবুকে।

এরকম অজস্র পর্যবেক্ষণের আলো ছড়িয়ে রয়েছে তার গবেষণামূলক রচনায়। এইসব দেখার সঙ্গে কিছু দৃষ্টান্তের উল্লেখে তিনি যেন পান কিছু সত্যের সন্ধানও। অন্য এক জীবনের বোধ। গল্প বলবার ভঙ্গিতে তিনি লিখেছেন সিপাহী বিদ্রোহের সময়ের কিছু ইংরেজ পলাতক সিপাহীদের ভয়ে কোনো এক গোলাঘরে আশ্রয় নিয়েছিল। সিপাহীরা যখন সেখানে পৌঁছায়, নজরে পড়ে বিস্তৃত হয়ে আছে একখানি টাটকা মাকড়সার জাল। মাকড়সার অক্ষত জাল দেখে ওদের নির্ঘাৎ মনে হয়েছিল ভিতরে কেউ নেই। আসলে ছেঁড়া জালও অতি দ্রুত মাকড়সা সারাই করে নিতে পারে। সুতরাং সিপাহীরা ফিরে যায় ব্যর্থ মনোরথ, বেঁচে যায় কয়েকটি বিপন্ন প্রাণ। হজরত মহম্মদের প্রাণ রক্ষার ক্ষেত্রেও একবার মদিনার এক পাহাড়ি গুহায় বিস্তৃত মাকড়সা জালের ভূমিকা রয়েছে। এরকম কথিত আছে। জাল মাত্র নির্ভেজাল ফাঁদ নয়, জালও কখনো প্রাণদায়ী হয়! জীবন এক বিচিত্র সত্যবদ্ধ জাল। আমরা আর কতটুকু জানি।

জানি না বলেই যুগে যুগে দেশে দেশে গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের মতো সহজিয়া বিজ্ঞানীর জন্ম হয়। সহজিয়া কবি হতে পারলে, বিজ্ঞানী কেন হবে না? তথাকথিত বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঘা বাঘা ডিগ্রি তার ছিল না, একদম স্বরচিত, স্বশিক্ষিত প্রকৃতিবিজ্ঞানী ছিলেন তিনি। তাঁর আগে এই বাংলায় তাঁর কোনো দিশারী পূর্বসুরী ছিলেন না যাকে তিনি অনুসরণ করতে পারতেন। এখানেই তাঁর স্বকীয়তা, মৌলিকতা, অসাধারণত্ব, ভিন্নধর্মী চিন্তনের আশ্চর্য ক্ষমতা।

একটি কবিগানের অনুষ্ঠান

তিনি তো কেবল বিজ্ঞানী ছিলেন না। দীর্ঘকাল 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার দায়িত্ববান সম্পাদক ছিলেন। তার সামাজিক কর্মকাণ্ডও কম না। 'উচ্চ জাতের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তিনি তার প্রথম যৌবনে প্রচুর ব্যঙ্গ কবিতা, ছড়া, কবিগান, নাটক ইত্যাদি রচনা করেন। তাঁর সমাজ-সংস্কারমূলক কাজগুলি উচ্চবর্ণের হিন্দুরা মেনে নিতে পারেননি।' 'অবশ্য এজন্য তাকে নানাভাবে নাজেহাল হতে হয়।' তিনি তারপর 'নতুন ধরনের একটি জারিগানের দল' গড়ে তোলেন। তাঁর অনুজ পঙ্কজবিহারী ভট্টাচার্য স্মৃতিচারণে লিখেছেন 'গোপালচন্দ্র ছিলেন সেকালের দক্ষ শিল্পী ও কবিয়ালদের গুরু। কবিয়াল হিসেবে তিনি ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলার গান রচনা করেছিলেন—

শোনো ভাই সকলে
আশ্চর্য কলিকালে
ঘটিল ভাওয়ালে
অপূর্ব ঘটন...' ইত্যাদি ইত্যাদি।

আসলে ব্যতিক্রমী, বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন গোপালচন্দ্র। তাঁর মনের সঞ্চারও বহুগামী হবে এই তো স্বাভাবিক। গবেষণার বিষয়ও বিন্দু পেরিয়ে ছড়িয়ে পড়বে বৃত্তের বাইরে। ওই তো ওখানে একজন মহিলা-মাকড়সা দিব্যি কচড়মচড় করে চিবিয়ে খাচ্ছে তার সদ্যসঙ্গমক্লান্ত প্রিয় পুরুষটিকে। ওই তো মাটিতে গর্ত খুঁড়ে আপন মনে ডিম পেড়ে চলেছে একটি কুমরে পোকা... বাবুই বাসায় নিভছে জ্বলছে জোনাকির লুসিফেরজ, লুসিফেরিন আলো...

লেখক প্রাক্তন জীববিদ্যার শিক্ষক, কবি ও প্রাবন্ধিক।

• *M. 9432523890*

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

মাকড়সার বিচিত্র শিকারকৌশল

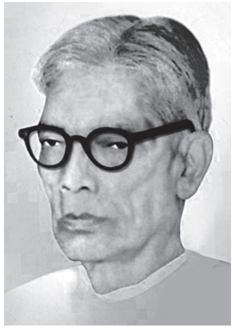

আমাদের দেশে বিভিন্ন জাতীয় অসংখ্য রকমারি মাকড়সা দেখতে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে কতকগুলি জাল পেতে শিকার ধরে, কতকগুলি হিংস্র জন্তুজানোয়ারদের মতো দূর থেকে শিকারের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে; কেউ কেউ আশেপাশের অবস্থার সঙ্গে বেমালুম আত্মগোপন করে নির্জীব পদার্থের মতো চুপ করে বসে থাকে— কীটপতঙ্গেরা ভুল করে নিকটে আসামাত্র পলায়ন করার পথ পায় না। কেউ কেউ আবার জলের উপর ঘোরাফেরা করে ছোট ছোট মাছ ধরেই জীবিকানির্বাহ করে।

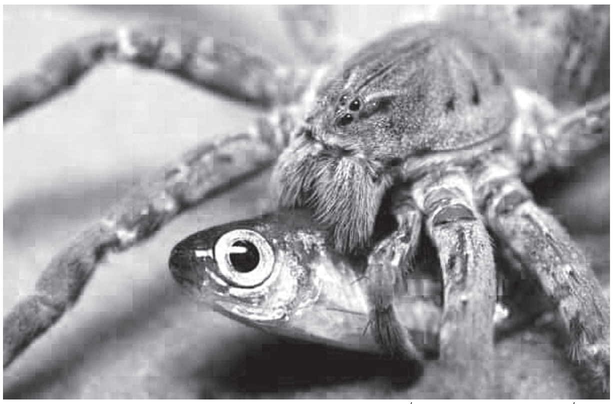

তাছাড়া এমন কতকগুলি মাকড়সাও দেখা যায়, যারা পিঁপড়ের মতো দল বেঁধে শিকার আয়ত্ত করে এবং সকলে মিলে ভাগাভাগি করে খায়। যে-সকল মাকড়সা জাল পেতে শিকার ধরে তারা সন্ধ্যার একটু আগেই জাল তৈরি করে তার মধ্যস্থলে—কেউ কেউ আবার জালের বাইরে কোনো নিরিবিলি স্থানে চুপ করে বসে থাকে। জালের সুতোর গায়ে বিন্দু বিন্দু আঠালো পদার্থ মালার মতো সজ্জিত দেখা যায়। কোনো কীটপতঙ্গ উড়ে এসে জালে পড়ামাত্রই আঠায় আটকে যায়। জালের বন্ধন হতে মুক্ত হওয়ার জন্য শিকার প্রাণপণ চেষ্টা করতে শুরু করে। এই সময় মাকড়সাটা ছুটে গিয়ে ফিতের মতো চওড়া সুতোর ফালি বের করে তাকে সম্পূর্ণরূপে জড়িয়ে ফেলে এবং পুঁটলির মতো করে জালের মধ্যস্থলে ঝুলিয়ে রাখে। তারপর অবসরমতো শিকারের রস-রক্ত চুষে খায়।

ল্যাবরেটরিতে প্রতিপালন করার সময় আমাদের দেশের সাদা-কালোয় বিচিত্রিত বড় বড় তাঁতিবউ মাকড়সাগুলি টিকটিকি, গিরগিটি এবং ছোট ছোট গেছোব্যাং প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীকে জালে আটকিয়ে শিকার করতে দেখেছি। আমাদের দেশের সূর্যমণি লঙ্কার মতো আকৃতিবিশিষ্ট কালো অথবা হলুদ ও রূপোলি রঙে বিচিত্রিত বড় বড় মাকড়সাগুলি সময় সময় ছোট ছোট পাখিও শিকার করে থাকে।

আমাদের দেশের এক রকমের ছোট ছোট কালো রঙের মাকড়সা অদ্ভুত উপায়ে শিকার ধরে থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে এরা কোনো রকমের জাল তৈরি করে না। ইটের পাঁজর বা ভাঙা দেওয়ালের ফাটলের মুখে এলোমেলোভাবে খানিকটা সুতো জড়িয়ে রাখে মাত্র। ওই সুতোগুলির সঙ্গে সরু একগাছি সুতোর যোগ রেখে মাকড়সাটা ফাটলের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকে। নিশ্চিন্ত মনে চলাফেরা করার সময় কীটপতঙ্গেরা সুতোর সংস্পর্শে আসামাত্রই আটকা পড়ে যায়। টের পাওয়া মাত্রই মাকড়সাটা গুপ্তস্থান থেকে ছুটে এসে শিকারটার উপর ঠিক থুতুর মতো কতকগুলি জড়ানো সুতো নিক্ষেপ করে তাকে সম্পূর্ণরূপে ঢেকে ফেলে। শিকারের তখন আর মুক্ত হওয়ার কোনোই আশা থাকে না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর মাকড়সা সুতোর পুঁটুলিতে আবদ্ধ জ্যান্ত শিকারটাকে ফাটলের মধ্যে নিয়ে যায় এবং তার রস-রক্ত চুষে খায়।

বাংলাদেশের মাছ শিকারি মাকড়সাদের মাছ শিকারকৌশলও চমৎকার। দমদমের কাছে একটা জলাশয়ে দেখেছিলাম অনেক তেচোখো মাছ পুকুরের শালুক ও ঘাসপাতার আড়ালে বা তাদের কাছাকাছিই ঘুরে বেড়ায়। পাতার ধারে নিশ্চলভাবে বসে থাকা কোনো একটা মাকড়সার নিকটবর্তী হওয়া মাত্রই অব্যর্থ লক্ষ্যে সে কোনো একটা মাছের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সাঁড়াশির মতো বিষদাঁত বিদ্ধ করে তাকে পাতার উপর টেনে তোলে। তারপর অনেকক্ষণ ধরে ধীরে ধীরে তাকে উদরস্থ করে। এই জাতীয় স্ত্রী-মাকড়সারা ডিমের থলি সঙ্গে নিয়েই জলের উপর ঘোরাফেরা করে এবং ডিম ফোটার পর বাচ্চাগুলিও মায়ের পিঠের উপর বসে থাকে। কোনো কারণে ভয় পেলে স্ত্রী-মাকড়সাটা বাচ্চাগুলিকে নিয়েই ১৫-২০ মিনিট পর্যন্ত জলের নীচে ডুবে থাকতে পারে।

বেশিরভাগ বাড়ির ঘরের দেওয়ালে বা মেঝেতে প্রায় সিকি ইঞ্চি লম্বা সাদা-কালো ডোরাকাটা একরকম মাকড়সা দেখতে পাওয়া যায়। এদের শিকার ধরার পদ্ধতি ঠিক শিকারি বিড়ালের মতো। প্রধানত এই মাকড়সারা মাছি শিকার করে বেঁচে থাকে। কোথাও একটা মাছিকে বসে থাকতে দেখলেই মাকড়সা দূর থেকে একরকম লাফাতে লাফাতেই তার নিকটে উপস্থিত হয়। অনেকটা কাছে আসার পর গতিবেগ কমিয়ে দেয় এবং পা টিপে অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হতে থাকে। তিন-চার ইঞ্চি ব্যবধানে থাকতেই মাছিটার ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ে। যদি দেখে মাছিটা তার দিকেই মুখ করে আছে, তবে পাশের দিকে ঘুরে তার পিছনে উপস্থিত হয় এবং সেখান থেকেই তাকে আক্রমণ করে। এদের বাচ্চাগুলি কিন্তু রাহাজানি করেই খাদ্য সংগ্রহ করে। এরা পিঁপড়ের লম্বা লাইনের ধারে চুপ করে বসে থাকে। সুবিধা বোঝা মাত্রই অকস্মাৎ লাফিয়ে পড়ে পিঁপড়ের মুখ থেকে খাবার ছিনিয়ে নিয়ে চম্পট দেয়। আমাদের দেশের কাঁকড়া মাকড়সার শিকারকৌশলও কম বৈচিত্র্যপূর্ণ নয়। এরাও লতাপাতা ও ফুলের সঙ্গে দেহের রং মিলিয়ে ঠিক গঙ্গাফড়িঙের মতোই প্রতারণার আশ্রয়ে শিকার ধরে থাকে। তাছাড়া পিঁপড়ে মাকড়সাদের শিকারপ্রণালীও অতীব কৌতূহলোদ্দীপক। এরা পিঁপড়ের ছদ্মবেশে পিঁপড়ের দলে মিশে তাদেরকেই শিকার করে থাকে। মোটের উপর একমাত্র কীটপতঙ্গের মধ্যে অনুসন্ধান করলেও এমন আরও অনেক কৌশলের পরিচয় পাওয়া যাবে, যা মনুষ্য উদ্ভাবিত কৌশল অপেক্ষা কোনো অংশেই হীন নয়।

সু মি ত্রা চৌ ধু রী

এক অচিরাচরিত বিজ্ঞানী

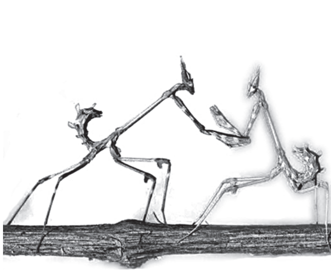

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য সর্ব অর্থেই ব্যতিক্রমী সম্পূর্ণ দেশজ এক বিজ্ঞানী, তাঁর প্রাথমিক পরিচয়—ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত পড়াশোনা করার পর আর্থিক কারণে পড়া ছাড়তে বাধ্য হওয়া এক দরিদ্র গ্রাম্য মানুষ। অথচ বিজ্ঞান গবেষণা, বিজ্ঞান শিক্ষাদানে তাঁর অবদান অননুকরণীয়। কোনো পাশ্চাত্যের জ্ঞানভাণ্ডার থেকে নয়, এই বাংলার (অবিভক্ত ও বিভক্ত) গাছপালা, কীটপতঙ্গ, পশুপাখিদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় অনলস পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ গবেষণাই ছিল তাঁর আজীবন জীবনচর্চা। বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামের অখ্যাত গোপালচন্দ্র একক উদ্যম, অধ্যবসায় নিয়ে নিরীক্ষণ করেছেন কীটপতঙ্গের আচার আচরণ, জলাভূমি ও পাঁচীর মার ভিটায় দেখা ভৌতিক আলো, এদের কারণ অনুসন্ধান করেছেন, পরীক্ষার ফলাফল লিপিবদ্ধ করেছেন। একই সঙ্গে গ্রামের 'অন্ত্যজ'দের লেখাপড়া শেখানো, গ্রামবাংলার জারিগান, কথকতার মাধ্যমে গ্রামের মানুষকে বিজ্ঞানমনস্ক করতে চেষ্টা করেছেন।

গোপালচন্দ্রের জন্ম ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের ১ আগস্ট পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার লোনসিং গ্রামের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে। তিনি প্রথম সন্তান, পরে আরো তিনটি ভাই। তাঁর সাড়ে পাঁচ বছরে বাবা অম্বিকাচরণ প্রয়াত হলে মা শশীমুখী চারটি শিশুসন্তান নিয়ে বিপর্যস্ত সহায় সম্বলহীন সংসারের হাল ধরেন। দশ-এগারো বছর বয়স থেকেই গোপালচন্দ্রকে পড়াশোনার পাশাপাশি পারিবারিক বৃত্তি পৌরোহিত্য যাজনিক কাজ করে সংসারের অর্থ সংস্থান করতে হয়েছে। অত্যন্ত মেধাবী গোপালচন্দ্র ১৯১৩ সালে ফরিদপুর জেলায় প্রথম স্থান অধিকার করে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। কৃতিত্বের জন্য স্কুলের শিক্ষক, প্রতিবেশী ও গুণগ্রাহীরা একটি সংবর্ধনা সভার আয়োজন করে এই সভায় সংগৃহীত অর্থ গোপালচন্দ্রকে উচ্চশিক্ষার জন্য দান করেন। তিনি গ্রাম ছেড়ে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে ভর্তি হলেন ময়মনসিংহ জেলার আনন্দমোহন কলেজে। কিন্তু পারিবারিক ও আর্থিক কারণে দ্বিতীয় বছরেই পড়াশোনা ছেড়ে তাঁকে ফিরে আসতে হয় লোনসিং-এ এবং লোনসিং স্কুলেই শিক্ষকতার চাকরি পান। ছাত্রজীবন থেকেই জিজ্ঞাসু অনুসন্ধিৎসু মনের তাগিদে শুরু হয়েছিল তাঁর নিজস্ব প্রকৃতিপাঠ।

স্কুলে শিক্ষকতা করার সময় ছাত্রদের নিয়ে কৃত্রিম উপায়ে ফুলের পরাগ সংযোগ করে সংকর উদ্ভিদ তৈরির নানা পরীক্ষা করেন। এর পাশাপাশি শতদল নামে একটি হাতে লেখা মাসিক পত্রিকা প্রকাশ, হিন্দু সমাজের তথাকথিত 'অন্ত্যজ'-দের শিক্ষা প্রসারের জন্য 'কমলকুটির' নামক সংস্থা তৈরি এবং সেই সঙ্গে তৎকালীন সামাজিক ব্যবস্থা ও লোকচরিত্র নিয়ে একটি জারি গানের দল তৈরি করেন। বিজ্ঞান সাধনার মতই স্বতঃস্ফূর্ত তাঁর সাহিত্যভাবনা, সংগীতবোধ। কোনোক্ষেত্রেই কোনো 'কৃত্রিম পণ্যে' পসরা সাজাননি। কলেজে পড়তে পড়তেই 'পাঁচীর মার ভিটা' (পচা গাছপালায় ভরতি একটি পোড়ো বাড়ি) ও অন্যান্য কয়েক জায়গার 'ভৌতিক' আলো দেখে কারণ খুঁজতে গিয়ে তিনি জৈবদ্যুতির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং নিজে দিনের পর দিন ঝোপজঙ্গলে অনুসন্ধান করে 'আলো' দেওয়া গাছপালা, মাটি সংগ্রহ করে আনেন। এই নিয়েই *প্রবাসী* পত্রিকায় তাঁর প্রথম বৈজ্ঞানিক রচনা প্রকাশিত হয়। (পচা গাছপালার আশ্চর্য আলো বিকিরণ করার ক্ষমতা—গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, *প্রবাসী* পৌষ সংখ্যা ১৩২৬ বঙ্গাব্দ)।

এই প্রবন্ধতেও দেখা যায় কোন গাছপালা কী অবস্থায় আলো দিচ্ছে তার বিশদ বর্ণনা দিয়ে তিনি বলছেন 'এ ব্যাপারে প্রকৃত রাসায়নিক তথ্যটা *প্রবাসী*-র মারফত সবিস্তারে কেউ জানাতে পারলে আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ হত। কারো পরীক্ষার দরকার হলে ওরকম দু-এক খণ্ড আলো দেওয়া পচা পাতা বা আরো কিছু পাঠাতে পারি। যা তিনি পারেননি তার অকপট স্বীকারোক্তি এবং অপর কোনো আগ্রহীকে অসূয়াহীন সাহায্যের আশ্বাস—এমনই ছিল গোপালচন্দ্রের বিজ্ঞান-মনস্কতা।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলকাতার কাশীপুরে বেঙ্গল চেম্বার্স অফ কমার্সের টেলিফোন অপারেটরের চাকরি পান। এই সময়েই তাঁর *প্রবাসী*-র প্রবন্ধ জগদীশচন্দ্র বসুকে আকৃষ্ট করে এবং বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাশের মাধ্যমে গোপালচন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁকে বসু বিজ্ঞান মন্দিরে যোগ দিতে বলেন। ১৯২১-এ স্বভাব-বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র

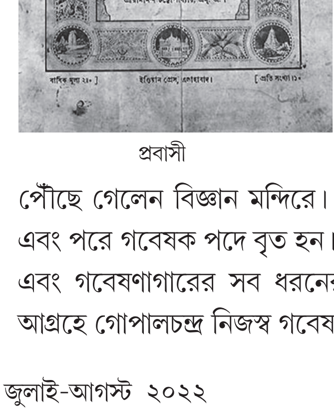

প্রবাসী

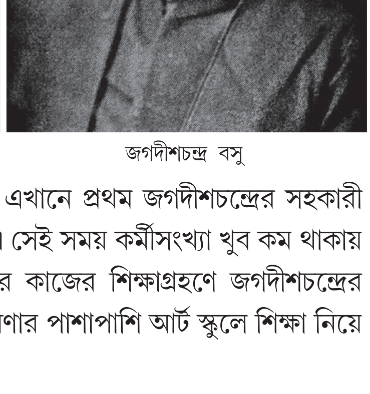

জগদীশচন্দ্র বসু

পৌঁছে গেলেন বিজ্ঞান মন্দিরে। এখানে প্রথম জগদীশচন্দ্রের সহকারী এবং পরে গবেষক পদে বৃত হন। সেই সময় কর্মীসংখ্যা খুব কম থাকায় এবং গবেষণাগারের সব ধরনের কাজের শিক্ষাগ্রহণে জগদীশচন্দ্রের আগ্রহে গোপালচন্দ্র নিজস্ব গবেষণার পাশাপাশি আর্ট স্কুলে শিক্ষা নিয়ে

যন্ত্রপাতির ছবি আঁকা, ফোটোগ্রাফি, গবেষণার পাণ্ডুলিপি টাইপ করা সব কিছুই শিখে নিয়েছেন। সঙ্গে ছিল বিজ্ঞান প্রবন্ধ রচনার কাজ। ১৯২১ থেকে ১৯৭১—এই দীর্ঘ সময় তিনি গাছপালা, কীটপতঙ্গ, জৈবদ্যুতি এবং শেষের দিকে ব্যাঙাচি থেকে ব্যাঙে রূপান্তরে পেনিসিলিনের ভূমিকা নিয়ে গবেষণা করেছেন। ১৯৩০-এ বাংলার মাছখেকো মাকড়সা সম্বন্ধে তাঁর বিশদ পর্যবেক্ষণ বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ট্রানজ্যাকশনে বেরোয়। ১৯৩৪-৩৫-এ পিঁপড়ে অনুকারী মাকড়সা, টিকটিকি শিকারী মাকড়সা সম্পর্কে চারটি গবেষণাপত্র বোম্বের *ন্যাচারল হিস্ট্রি সোসাইটি*, আমেরিকান *সায়েন্টিফিক মান্থলি* এবং কলকাতার *সায়েন্স অ্যান্ড কালচার*-এ প্রকাশিত হয়। জগদীশচন্দ্র আশা করেছিলেন এই গবেষণা নিবন্ধগুলি তাঁকে বিদেশেও পরিচিতি দেবে এবং বিদেশে এই ধরনের কাজ যাঁরা করেছেন তাঁদের সঙ্গে মতামত বিনিময় করতে পারবেন কিন্তু ১৯৩৩-এ হিটলারের অভ্যুত্থান এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে এই আশা অপূর্ণ থেকে যায়। ১৯৩৬-১৯৪৩-এর মধ্যে গোপালচন্দ্রের ১৪টি উচ্চমানের গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৫২-১৯৭১ এই সময়কালে 'ব্যাঙাচি থেকে ব্যাঙ' রূপান্তরে পেনিসিলিনের ভূমিকা নিয়ে গবেষণা করেছেন। 'ব্যাঙাচি' থেকে ব্যাঙ হওয়ার ঘটনা সবাই জানেন। আয়োডিন ঘটিত থাইরক্সিন হর্মোনের প্রভাবে এই পরিবর্তন সাধিত হয়। কিন্তু গোপালবাবু লক্ষ করলেন যে, পেনিসিলিনের প্রভাবে এই রূপান্তর থেমে যায়। ব্যাঙাচিগুলো বড়ো ব্যাঙাচি থেকে যায়—আর ব্যাঙ হয় না। সেই সময় বিখ্যাত বিজ্ঞানী জুলিয়ান হাক্সলে কলকাতায় এসেছিলেন। তাঁকে গবেষণার ফলাফল দেখানো হয়। তিনি বলেন ব্যাপারটা খুবই রহস্যজনক। একটা রিপোর্ট নেচার পত্রিকায় দেওয়া উচিত (সেটা কিন্তু আর কখনোই করা হয়নি)।

এই উদ্ধৃতি বাইরের জগতে গোপালচন্দ্রের যথেষ্ট স্বীকৃতি না পাওয়ার আক্ষেপ থেকে উল্লেখ করা হচ্ছে না—উল্লেখ এই কারণেই যে এই 'রহস্য' সমাধান নেচার পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও গোপালচন্দ্র নিজেই গবেষণা করে রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন। তিনি দেখালেন ব্যাঙাচির শরীরে বাসা বাঁধা কতকগুলি ভিটামিন বি-১২ সংশ্লেষণকারী ব্যাকটিরিয়া পেনিসিলিনের প্রভাবে মারা যায় এবং ভিটামিনটির অভাবেই ব্যাঙাচি থেকে ব্যাঙে রূপান্তর ব্যাহত হয়। এই রূপান্তর না হওয়া ব্যাঙাচিদের ভিটামিন বি-১২ প্রয়োগ করে দেখা গেল যে আবার ব্যাঙাচি—ব্যাঙে রূপান্তর ঘটছে। এইভাবে পিঁপড়ে, মাকড়সা ও অন্যান্য কীটপতঙ্গদের ক্ষেত্রে পরীক্ষা পর্যবেক্ষণের ফলে কোনো অমীমাংসিত তথ্য খুঁজে পেলে অনলস ধৈর্য ও অধ্যাবসায় নিয়ে সমাধান খুঁজেছেন আবার না পারলে অকপটে স্বীকার করেছেন। বিজ্ঞানগবেষক গোপালচন্দ্রর পাশাপাশি হয়ত-বা আরো উজ্জ্বলভাবে তাঁর যে পরিচয়টি উঠে আসে সেটি বিজ্ঞান সাহিত্যিক ও সম্পাদক গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য।

সাধারণ মানুষের মধ্যে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার কাজে সব থেকে আগ্রহী হয়ে ওঠেন প্রবাদ প্রতিম বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু। বিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারের জন্য ১৯৪৮-এর ২৫ জানুয়ারি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ওই দিন থেকেই শুরু হয় *জ্ঞান ও বিজ্ঞান* পত্রিকার প্রকাশ। এই সময়েই সত্যেন্দ্রনাথ পত্রিকা সম্পাদনার জন্য গোপালচন্দ্রকে আহ্বান জানান। এর অনেক আগে থেকেই *প্রবাসী*, *প্রকৃতি*, *বঙ্গবাসী*, *বঙ্গশ্রী* প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিতভাবে গোপালচন্দ্রের বিজ্ঞান প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছিল। প্রায় তিন দশক জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সম্পাদক রূপে কাজ করে তিনি বিজ্ঞান সাহিত্যে এক নতুন দিক খুলে দিয়েছেন অন্যের লেখা প্রবন্ধের সম্পাদনায়, এ ছাড়া স্বনামে এবং বেনামে তাঁর অজস্র প্রবন্ধ লেখাই শুধু নয় তাঁরই হাতে গড়ে উঠেছে নতুন এক বিজ্ঞান লেখকগোষ্ঠী যাঁদের অনেকেই আজ লেখক হিসাবে অত্যন্ত কৃতী। সর্বসাধারণের জন্য বা ছোটদের জন্য বিজ্ঞানের লেখা কেমন করে লিখতে হবে তা শিখিয়েছেন। ভাষার অহেতুক জটিলতা বাহুল্য বর্জন করে স্বচ্ছ, সহজ অথচ সরসভাবে বৈজ্ঞানিক তথ্য পরিবেশন করে দেখিয়েছেন বিজ্ঞান প্রবন্ধ কেমন হবে। তাঁর কয়েকশো রচনা একই সঙ্গে সার্থক বিজ্ঞান এবং সার্থক সাহিত্য। *জ্ঞান ও বিজ্ঞান* পত্রিকায় একটি ছোটদের বিভাগ খুলে ছোটদের উপযোগী রচনা এবং বহু সহজবোধ্য বৈজ্ঞানিক মডেল তৈরি শিখিয়েছেন (যেগুলি 'করে দেখো' নামে তিনখণ্ডে বই হয়ে বেরিয়েছে।

যাঁর গভীর পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা এবং সেগুলির লিপিবদ্ধ বর্ণনায় পুষ্ট হয়েছে আমাদের বিজ্ঞান, বিজ্ঞান সাহিত্য সেই মানুষটি পুরস্কার, সম্মান পেয়েছেন সত্তরোর্ধ্ব বয়সে। ১৯৬৮-তে আনন্দ পুরস্কার, ১৯৭৪-এ বসু বিজ্ঞান মন্দিরে নাগরিক সংবর্ধনা, ওই বছরই শুরু হওয়া

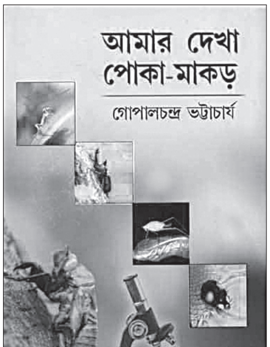

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সত্যেন্দ্রনাথ বসু স্মৃতিফলক, ১৯৭৫-এ *বাংলার কীটপতঙ্গ* বইটির রচয়িতা হিসাবে রবীন্দ্র পুরস্কার, ১৯৭৯-তে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের হীরক জয়ন্তী উপলক্ষে জুবিলি পদক এবং ১৯৮১-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্মানিক ডি.এসসি. ডিগ্রি। তিনিই সম্ভবত প্রথম অস্নাতক ভারতীয় যিনি সাম্মানিক ডি.এসসি. ডিগ্রি পান।

১৯৮১-র ৮ এপ্রিল গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রয়াত হন।

লেখক প্রাক্তন অধ্যক্ষ, ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন কলেজ, কলকাতা, সভাপতি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

email: sumitraasok@gmail.com • M. 8910443482

প্রচ্ছদ কথা-৩

সি দ্ধা র্থ জো য়া র দা র

প্রকৃতিবিজ্ঞানী গোপালচন্দ্রকে স্মরণ

মাঝে মাঝে যোগেন মাস্টার ছেলেদের ডেকে এনে ম্যাজিকের খেলা দেখাতেন। একটা মজার জিনিস দেখাবেন বলে তিনি ক্লাসরুমে মাস্টার, ছাত্র সবাইকে ডেকে নিয়ে এলেন। পকেট থেকে গাঢ় খয়েরি রঙের কতগুলি বিচি বের করে মাস্টারদের হাতে দিয়ে বললেন—দেখুন তো জিনিসটা কি এবং এতে কোনও ছিদ্র বা টুটা-ফাটা আছে? দেখতে কতকটা কাঁইবিচির মতো মনে হলেও আসলে তা নয়, কোন একটা অজানা ফলের বিচি—মসৃণ ও গোলাকার, কোথাও কোন টুটা-ফাটা নেই। বিচিগুলি টেবিলের উপরে রাখার কয়েক মিনিট পরেই একটা বিচি হঠাৎ প্রায় চার ইঞ্চি উঁচুতে লাফিয়ে উঠল। তারপর এদিক-ওদিক প্রায় সবগুলি বিচিই থেকে থেকে লাফাতে শুরু করল। অবাক কাণ্ড! কিভাবে এটা সম্ভব হতে পারে? কেউই বুঝতে না পারায়, অবশেষে মাস্টারমশাই ছুরি দিয়ে একটা বিচি চিরে ফেলতেই দেখা গেল, তার ভেতরে রয়েছে একটা পোকা (লার্ভা)। টেবিলের উপর পড়েই পোকাটা ধনুকের মতো শরীরটাকে বাঁকিয়ে দুপ্রান্ত একত্রিত করে অদ্ভুত ভঙ্গীতে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। এই ঘটনা থেকেই কীটপতঙ্গ, পোকামাকড় সম্বন্ধে একটা কৌতূহল জন্মেছিল কিশোর গোপালচন্দ্রের।

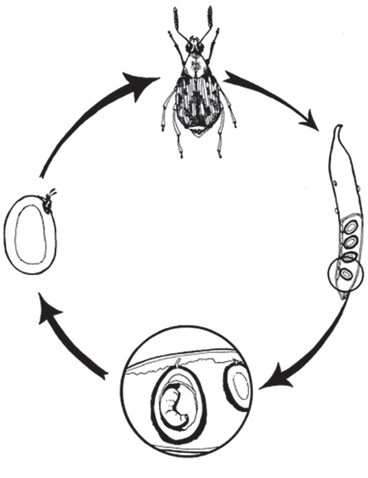

বীজের মধ্যে ব্রুচীডের জীবচক্রের আংশিক ক্রিয়া

বস্তুতঃ সেই থেকেই পিঁপড়ে, মাকড়সা, প্রজাপতি প্রভৃতি কীটপতঙ্গের স্বভাব, জীবনযাত্রা প্রণালী, বসতি ইত্যাদি বিষয়ে জানবার ব্যাপারে বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের কৌতূহল ছিল অপরিসীম। আর হয়ত তাই তাঁর মৌলিক গবেষণা ছিল প্রধানতঃ মাকড়সা, পিঁপড়ে, প্রজাপতি, শুঁয়োপোকা, মাছ ও ব্যাঙাচি নিয়ে। পথেঘাটে যেখানে তিনি যেতেন, সব জায়গায় তাঁর তীক্ষ্ণ কৌতূহলী দৃষ্টি পড়ত। পোকামাকড়েরা কোথায় কী করছে, কী খাচ্ছে প্রভৃতি খুঁটিয়ে দেখতেন।

পন্ডিতসার ও লোনসিংহ স্কুলে শিক্ষকতা (১৯১৫-১৯) করার সময় তিনি ছাত্রদের নিয়ে গাছপালা সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মেতে থাকতেন। কৃত্রিম উপায়ে ফুলের পরাগসঙ্গম ঘটিয়ে সংকর উদ্ভিদ তৈরির চেষ্টা, কলমের সাহায্যে একই গাছে দুই-তিন রকমের ফুল উৎপাদন করা ছিল পরীক্ষার বিষয়। এরকম একটা সময়ে এক বর্ষার সন্ধ্যায় স্কুল বোর্ডিং-এর আড্ডায় ভূতের গল্প নিয়ে তর্কের প্রসঙ্গে 'পাঁচির মা'-র ভিটেয় গিয়ে সংগ্রহ করে এনেছিলেন তথাকথিত ভৌতিক আলোর উপকরণ সূত্র। ১৩২৬-এর পৌষ মাসের 'প্রবাসী' পত্রিকায় (ডিসেম্বর ১৯১৯) এই বিষয়ের উপর প্রকাশ করেন 'পচা গাছপালার আশ্চর্য আলো বিকিরণ করবার ক্ষমতা নামে একটি প্রবন্ধ। এই লেখাটির ওপর চোখ পড়ে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর। তিনি গোপালচন্দ্রের অনুসন্ধিৎসায় আকৃষ্ট হয়ে বসু বিজ্ঞান মন্দির-এর কর্মকাণ্ডে তাঁকে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান। কাশীপুরের বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের টেলিফোন অপারেটার গোপালচন্দ্র সেই আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারেননি।

প্রথমদিকে গাছপালার ওপর গবেষণার কাজ শুরু করলেও ধীরে ধীরে কীটপতঙ্গের ওপর গবেষণায় তাঁর আগ্রহ বাড়তে থাকে। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের গবেষণাগারে স্বাভাবিক পরিবেশ তৈরি করে তার মধ্যে তিনি মাকড়সা, পিঁপড়ে, প্রজাপতি প্রভৃতি প্রতিপালন করে এদের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতেন। আমাদের দেশে মাকড়সা যে মাছ, ব্যাঙাচি, চামচিকা, টিকটিকি, আরশোলা, কাঁকড়াবিছা এমনকি ছোট সাপ ধরে খায়, তা গোপালচন্দ্রই প্রথম লক্ষ্য করেন। তাঁর প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ জলের মাকড়সা নিয়ে (১৯৩১)। তিনি গেছো-মাকড়সার ওপর সুদীর্ঘ পর্যবেক্ষণ করে দেশি ও বিদেশি পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

প্রজাপতির জীবনেতিহাস সম্বন্ধে তিনি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। কুৎসিত শুঁয়োপোকার সুন্দর প্রজাপতিতে পরিণত হওয়া হরমোন দ্বারা কিরূপে প্রভাবান্বিত বা নিয়ন্ত্রিত হয়, তা আজ জানা গেলেও ৮০ বছর আগে তা অজানাই ছিল। গোপালচন্দ্রের গবেষণা ও প্রকাশিত প্রবন্ধ এ বিষয়ে নতুন দিশা দেখিয়েছিল।

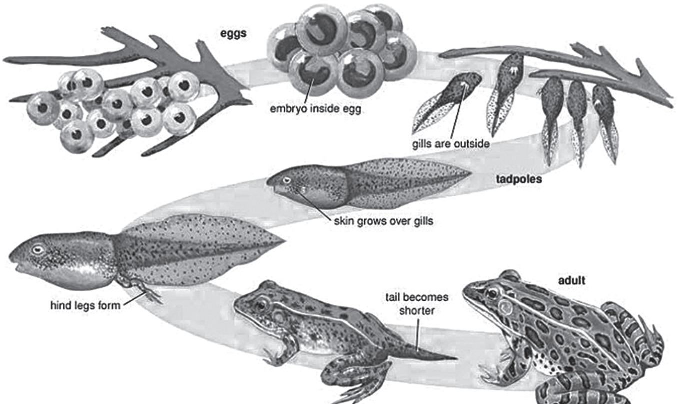

ব্যাঙাচির ব্যাঙে রূপান্তর

গোপালচন্দ্রের তিনটি গবেষণা-কাজ আন্তর্জাতিক স্তরের প্রথম সারির। একটি হল—নালসো পিঁপড়ের জীবনচক্র সংক্রান্ত; দ্বিতীয়টি পোকার অপত্যস্নেহ বিষয়ক এবং অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আর একটি ব্যাঙাচি থেকে ব্যাঙের রূপান্তরে পেনিসিলিনের ভূমিকার ওপর।

গোপালচন্দ্র তাঁর কর্মজীবনে আটশো (মতান্তরে বারোশো) বিজ্ঞান-প্রবন্ধ রচনা করেন। আবার কেউ কেউ বলেন, তাঁর মোট প্রবন্ধের সংখ্যা ১৩০৫। সংখ্যা যাই হোক প্রয়োজন সমস্ত প্রবন্ধের তথ্যপঞ্জিকরণ করা ও একটি প্রবন্ধ সংকলনের উদ্যোগ নেওয়া।

লেখক অধ্যাপক, পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক।

email: joardar69@gmail.com • M. 9231533335

অ প রা জি ত ব সু

সম্পাদক গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

প্রকৃতিবিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদকের ভূমিকায় জীবনের অনেকটা সময় কাটিয়েছেন। ১৯৫০ সালে তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের মুখপত্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার সম্পাদক হন। ১৯৭৭ সালে তিনি সম্পাদক পদ ত্যাগ করেন। তারপরে তিনি পত্রিকার প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। কীটপতঙ্গের জীবনাচরণের গবেষক ও বিজ্ঞান-লেখক রূপে গোপালচন্দ্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এর প্রকাশনার আগে থেকেই বাঙালির কাছে পরিচিত ছিলেন।

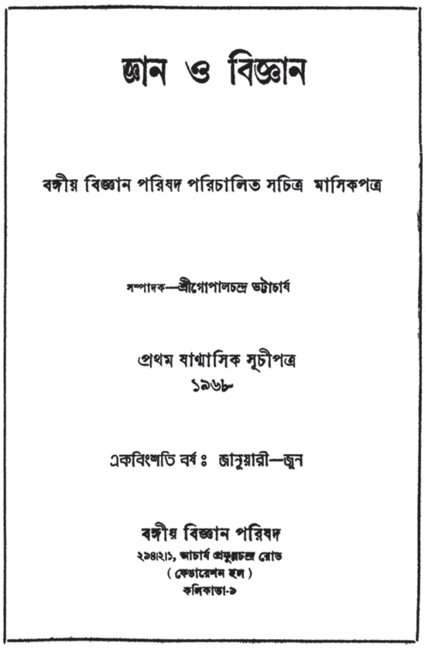

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত সচিত্র মাসিকপত্র

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

প্রথম ষাণ্মাসিক সূচীপত্র
১৯৬৮

একবিংশতি বর্ষ ঃ জানুয়ারী—জুন

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
(কেন্তারেশন হল)
কলিকাতা-৯

যে সময় বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয় (১৯৪৮) এবং 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' প্রকাশনা আরম্ভ হয় তখন দেশ দীর্ঘ পরাধীনতা কাটিয়ে সবে স্বাধীন হয়েছে। শত অসুবিধার মধ্যে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটি বাসনা দেশবাসীর মধ্যে ছিল। ইতিবাচক এই আবহাওয়া পরিষদ এবং তার পত্রিকাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল। দেশের অগ্রগতির জন্য বিজ্ঞানচর্চা আবশ্যক—এটা সকলেই বুঝতেন। তাই পরিষদ ও 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' সম্পর্কে জনমানসে একটা আগ্রহ ছিল।

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' যখন প্রকাশিত হয় তখন অন্য কোনো বিজ্ঞান-পত্রিকা ছিল না। 'প্রকৃতি' আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দেশ বিজ্ঞান-পত্রিকার জন্য প্রস্তুত নয়—এমন খেদোক্তি 'প্রকৃতি'-র সম্পাদক সত্যচরণ লাহা করেছিলেন। সত্যই ত্রিশ-চল্লিশের দশকে এমন অবস্থা ছিল। তারপর স্বাধীনতা আসে। স্বাধীনতার পরবর্তী আশাবাদী পরিবেশ অবস্থাটা বদলে দেয়।

পত্রিকা নিয়মিত বের করার জন্য উপযুক্ত লেখকমণ্ডলী তৈরি হতে সময় লেগেছিল। প্রচলিত পত্রিকাগুলিতে মাঝেমধ্যে দু-একজন বিজ্ঞান লিখতেন বটে, যেমন ছোটদের কাগজগুলিতেও বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে ছোট লেখা বের হত। পঞ্চাশ-ষাটের দশকে স্কুলে বিজ্ঞান গুরুত্ব দিয়ে পড়ানো হত না। এটা হতে হতে সত্তর দশকের মাঝামাঝি হয়ে যায়। সপ্তম শ্রেণি থেকে ভৌতবিজ্ঞান, জীবনবিজ্ঞান পড়ানো আরম্ভ হয় বারো ক্লাশের উচ্চমাধ্যমিকের প্রচলন হলে। বাংলাভাষায় বিজ্ঞান পড়া ও লেখার পরিবেশ তখন থেকে তৈরি হয়। তার আগে অর্থাৎ গোপালচন্দ্রের সম্পাদনার মূল পর্যায়ে প্রকাশযোগ্য রচনা পাওয়ার ক্ষেত্রে বেশ অসুবিধা ছিল।

অর্থাৎ প্রথম দিকে সম্পাদক গোপালচন্দ্রকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছিল। তখন লিখতেন প্রধানত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের অধ্যাপকেরা। তাতেও কুলোত না। তখন তিনি 'ছোটোদের পাতা' নামে একটা বিভাগ খুলে বিজ্ঞান সংবাদ ও সহজ পরীক্ষা (করে দেখ) প্রকাশ শুরু করলেন। গ. চ. ভ. নাম দিয়ে নিজেই 'করে দেখ' লেখাগুলি লিখতেন। বিদেশি পত্রিকা, বিদেশি দূতাবাস থেকে পত্রিকা আনিয়ে চিত্তাকর্ষক ছবিগুলি 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এ ছাপতেন।

গোপালচন্দ্র সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করার আগে (ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে) 'প্রবাসী' পত্রিকায় অনেক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাছাড়া 'প্রকৃতি', 'বঙ্গশ্রী', 'দেশ', 'যুগান্তর', 'সন্দেশ', 'শিশুসাথী' প্রভৃতি পত্রিকায় লিখেছিলেন। এগুলি চালাতেন মূলত সাহিত্যিকরা। সাহিত্যিকদের সঙ্গে মেলামেশার কারণে তাঁর মধ্যে একটা লেখকসত্তা গড়ে ওঠে। তাঁর লেখা ছিল সহজ, সুখপাঠ্য, মনোরম ও আকর্ষণীয়। এই গুণগুলি তাঁকে সম্পাদনার কাজে সাহায্য করেছিল। তিনি লেখা চিনতেন। কাকে দিয়ে কী লেখাতে হবে তা বুঝতেন। বাংলা ভাষার নিয়ম, বিধি জানতেন। লেখকদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতেন, প্রয়োজনে ডেকে পাঠাতেন। যে পল্লীগ্রাম, গ্রামের মানুষ, কীটপতঙ্গ ও পরিবেশ বাঙালিরা চেনে ও বোঝে তা ছিল তাঁর লেখার উপজীব্য ও গবেষণার বিষয়বস্তু। ফলে বাংলা ভাষাভাষীদের সঙ্গে তাঁর ছিল আত্মিক যোগাযোগ। সম্পাদক পদে বসেও তিনি লেখকসত্তা ছাড়েননি। যদিও 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এ কীটপতঙ্গ সংক্রান্ত মূল লেখাগুলি বের হয়নি (বেশি বেরিয়েছিল 'প্রবাসী'-তে), 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এ বেরিয়েছিল সমসাময়িক বিজ্ঞান বিষয়ে সংবাদ ও তথ্য, সেগুলিতেও বিজ্ঞান-সাহিত্যিকের মুন্সিয়ানার ছাপ পড়েছিল। বিজ্ঞান সাংবাদিকতার কাজ গোপালচন্দ্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এর পাতায় প্রথম শুরু করেছিলেন। এখন তো এটা বিজ্ঞান সাহিত্যের মূল ধারা। তিনি লিখতে শুরু করেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের সংক্ষিপ্ত জীবনী। এই লেখাগুলির মধ্যে বিজ্ঞানের ইতিহাসচর্চার উপাদান ছিল। লক্ষ করে দেখা গেছে, গোপালচন্দ্র স্বনামে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' বেশি লিখেছেন ১৯৫৫ পর্যন্ত। এরপর লেখক তৈরির কাজে বেশি ব্যস্ত থেকেছেন। তখন তাঁর বয়স ৬০ অতিক্রান্ত। সম্পাদনার কাজ ৫৫ বছর বয়সে শুরু করেও তিনি অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে সাফল্য অর্জন করেন এবং 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-কে পাঠকসমাজে প্রতিষ্ঠিত করেন। বর্তমান যুগের সকল প্রবীণ বাঙালি বিজ্ঞানী তাঁদের বাল্যে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পাঠের সুখকর স্মৃতি উল্লেখ করেন।

লেখক জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার সম্পাদক এবং বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক।

email: abasu5623@gmail.com • M. 9433467092

প্রচ্ছদ কথা-৫

দী প ক কু মা র দাঁ

প্রকৃতিবিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের অন্তর্নিহিত মানসলোক

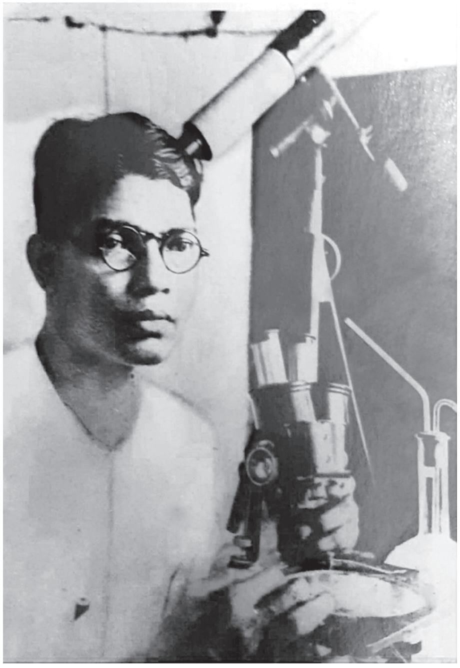

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য পল্লিবাংলার 'আশ্চর্য' রত্নবিশেষ, যিনি চারপাশের প্রকৃতি জগৎ থেকে আনকোরা অজস্র উপাদানের খোঁজ পান। অনুসন্ধানের আপন জগৎ গড়ে নেন। বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার লোনসিং গ্রামের ছেলে (জন্ম ০১.০৮.১৮৯৫, মৃত্যু ০৮.০৪.১৯৮১) গোপালচন্দ্র অভিযান করেছিলেন গভীর রাতের জোনাকিজ্বলা অন্ধকারে 'পাঁচির মার বাড়ির ভিটের আগুনের' রহস্য উন্মোচনে। এটাই ছিল তাঁর জীবনের প্রথম Turning point বা Breakthrough. আমাদের মধ্যে খুব কম জনই আছেন, যাঁরা এটা বারবার পড়েছেন ও গভীরভাবে অনুসন্ধান করেছেন। সমগ্র বিষয়টি 'প্রবাসী' (পৌষ ১৩২৩) পত্রিকায় প্রকাশিত হলে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর নজরে আসে। তিনি বসুবিজ্ঞান মন্দিরে যোগ দেবার আহ্বান পান (১৯২১-৭১)। এটি ছিল তাঁর বৈজ্ঞানিক জীবনকান্ডের দ্বিতীয় Turning point বা Breakthrough.

অনেকে বলেন গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য স্বশিক্ষিত বিজ্ঞানী। কথাটা কিছুটা ঠিক। সব মানুষই স্বশিক্ষায় কিছু না কিছু শিখে থাকেন চারপাশের পরিবেশ থেকে। কিন্তু কোটিতে গুটি বা এক-আধজনকেই গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য হয়ে উঠতে দেখা যায়। অন্য ধরনের একটা নেশা (passion) তাদেরকে অন্য জগতে নিয়ে যায় সংসারের জাগতিক সুখদুঃখের মধ্যে থেকেও তাদের কল্পনার জগৎ, কাজের ভাবনা, অন্বেষার বিচিত্র পসরা তাদেরকে ছুটিয়ে নিয়ে যায় অন্ধকারকে আলোকিত করতে। গোপালচন্দ্রের সমগ্র জীবন এই একই বৃত্তে ব্যস্ত থেকেছে প্রকৃতিজগতের রহস্য উন্মোচনে।

প্রকৃতি বিজ্ঞানী বিজ্ঞান সাহিত্যিক গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের রচনা সংকলন (প্রথম খণ্ড) থেকে—'প্রতি রবিবার বা ছুটির দিন তিনি নিয়মিতভাবে গ্রামে চলে যেতেন। পোকামাকড় তাঁর প্রধান আকর্ষণ হলেও মাছ, পাখি, অন্যান্য জীবজন্তু, প্রকৃতি পরিবেশের নানা খুঁটিনাটি বিষয় তিনি গভীর আগ্রহে পর্যবেক্ষণ করতেন। পকেটে থাকত একাধিক টেস্টটিউব, আতস কাঁচ, ব্যাগে কাচের জার এবং অবশ্যই ক্যামেরা। বেশিরভাগ সময়ই পোকামাকড়, জীবজন্তু ধরে এনে বসুবিজ্ঞান মন্দিরে নিজের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থায় রাখতেন। উদ্ভাবন করতেন পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য নানা বিচিত্র কর্মপন্থা। ক্রমশ অভিজ্ঞতায় সম্পৃক্ত হতে হতে পিঁপড়ে, মাকড়সা, কুমোরে পোকা, কাঠ কই, নেউলে পোকা—এমন বহু রচনা তাঁর কলম থেকে বেরিয়েছে, যা বিজ্ঞানী ফেবার, মারে, ফ্রিৎস প্রমুখ দিকপাল পতঙ্গ বিজ্ঞানীদের সঙ্গে তিনি সম-আসনে বসার যোগ্যতা আদায় করে নিয়েছেন।

সব বিখ্যাত মানুষকেই কঠিন পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে নিজেকে তৈরি করতে হয়। চলতি কথায় যাকে বলি, বহু ঘাটের জল খেয়ে। বসুবিজ্ঞান মন্দির থেকে তাঁকে নানা বিষয়ে প্রশিক্ষিত করা হয়— ফটোগ্রাফিচর্চা, ছবি আঁকা, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সারানো, ওয়ার্কশপ (লেদ মেশিন ব্যবহার) প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। নিঃসন্দেহে এসব কাজ তাঁকে পূর্ণতা প্রাপ্তির পথে গতিবেগ দিয়েছিল। অধ্যাপক মলিশের সাহচর্যে বসুবিজ্ঞান মন্দিরে 'ঠান্ডা আলো' নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছেন। বিজ্ঞানী দেবেন্দ্রমোহন বসুর সাহচর্যেও তিনি অনেক মূল্যবান গবেষণা কাজ করেছেন (ব্যাঙাচির জীবনচক্রে অ্যান্টিবায়োটিকের প্রভাব)।

বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অধ্যাপক রতনলাল ব্রহ্মচারী লিখেছেন, ১৯৪৩-এ পিঁপড়ে নিয়ে একটি মৌলিক গবেষণাপত্র প্রকাশিত হল বসুবিজ্ঞান মন্দিরের Transaction-এ। বাঙালির 'অন্ধত্ব' ঘুচল। ভারতে কীটপতঙ্গ নিয়ে এই প্রথম এ-ধরনের একটি গবেষণামূলক 'পেপার আত্মপ্রকাশ করল'।

বসুবিজ্ঞান মন্দিরের বিজ্ঞানীকুল মনে করতেন, গোপালচন্দ্র বড়োজোর একজন ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট। নিয়মমাফিক পদমর্যাদায় তিনি ছিলেন ঐ গোত্রের। এই জায়গায় তাঁর মানসলোক আহত হয়েছে গোটা কর্মজীবন ব্যাপী। স্বয়ং জগদীশচন্দ্র তাঁর উদ্ভিদ বিষয়ক গবেষণাতে 'কিছুই হয়নি' গোছের মন্তব্যে অগ্রাহ্য করেন। সমকাল তাঁর কাজের গুরুত্বকে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাঁর কাজের যথাযথ মূল্যায়ন না হওয়ায় তাঁর মানসলোক নানাভাবে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। ১৯৩৭ থেকে ১৯৫২-৫৩ অবধি তিনি প্রবাসীতে তাঁর গবেষণা ও পর্যবেক্ষণলব্ধ অভিজ্ঞতা ও প্রাণীবিজ্ঞানের পড়াগুলির উপর ভিত্তি করে ৫০টির বেশি লোকপ্রিয় জনবিজ্ঞানমূলক রচনা প্রকাশ করেছেন। এক হিসেবে কাজটি অতীব মূল্যবান। অন্যদিকে তাঁর গবেষণাজীবন বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে—একথাটা আজ অবধি কেউ উচ্চারণ করেননি। প্রতিটি নিবন্ধের জন্য তাঁকে বহু মনন ও পরিশ্রম সন্নিবেশ করতে হয়েছে। প্রবাসীর মতো জনপ্রিয় মাসিক পত্রিকা, যা বাঙালি পাঠকের সাহিত্যচিন্তার সর্বোচ্চ শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার ছিল। সেখানে নিয়মিত লেখার ঝক্কি বড় কম ছিল না। এটা যে তাঁর গবেষণা জীবনকে ব্যাহত করেছিল, তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

বিশিষ্ট বিজ্ঞান ইতিহাসের আলোচক অধ্যাপক সুবীরকুমার সেন লিখেছেন, 'অধ্যাপক সহায়রাম বসুকে গোপালচন্দ্র জৈবদ্যুতির উৎস যোগান দিয়েছিলেন। এই ধরনের জৈবদ্যুতির মূল উৎস বিবিধ জীবাণু, ফাংগাস প্রভৃতি। সহায়রাম বসু উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ছিলেন। ছত্রাক, ফাংগাস, মোল্ড তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র ছিল। এদেশে জৈবদ্যুতির বিষয়ে গবেষণার পথিকৃৎ কাগজে কলমে সহায়রাম বসুই। প্রশ্ন থেকে যায় গোপালচন্দ্র ও সহায়রাম পরস্পর সহায়ক গবেষণা কিছু করেননি কেন? কিংবা উভয়ের যৌথ প্রচেষ্টায় রূপ পাবার কোন সম্ভাবনাই কি ছিল না? সহায়রাম কলকাতার আর জি কর মেডিকেল কলেজে বোটানির অধ্যাপক ছিলেন। (জ্ঞানবিচিত্রা, মার্চ, ২০০৬)

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য ব্যক্তিজীবনে যুক্তিবাদী, নিরীশ্বরবাদী মানুষ ছিলেন। পাশাপাশি তাঁর মধ্যে ভারতীয়— ভাবালুতা বা ভাবাবেগ প্রবল ছিল, একথা বলা খুব দোষের নয়। কারণ তাঁর মধ্যে বড় বিজ্ঞানীর যাবতীয় স্বভাবগুণ থাকলেও তা তিনি কাজে লাগাননি, ভাবখানা এই বিজ্ঞানে তো উচ্চ ডিগ্রি নেই, প্রথামাফিক ল্যাবরেটরি সায়েন্টিস্টও নই। নেহাতই এলেবেলে প্রকৃতি প্রেমিক। এই দোলাচলের মনোভাবের কারণে তাঁর বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজ তিনি গবেষণাপত্র রচনা করে প্রকাশ করেননি। সামান্য যেটুকু করেছেন, যেমন তাঁর কয়েকটি গবেষণাপত্র 'Sience and Culture'-এ প্রকাশিত। এটা বহুল প্রচারিত বৈজ্ঞানিক জার্নাল নয়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এটা ঘোর অমনোযোগিতা?

আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল তাঁর প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের অন্তর্নিহিত মানসলোকের সন্ধান। প্রথমেই বলতে হয় পরিবেশের প্রভাব। গ্রামের দরিদ্র অতিসাধারণ পরিবারের ছেলে পারিবারিক-অর্থনৈতিক সঙ্কটেও জেরবার ছিলেন। বিধবা মা ও ছোট ছোট তিনটে ভাই। তাদের ভরণপোষণ ও শিক্ষাদীক্ষা, নিজের পরিবার সহ। কলকাতায় উল্টাডাঙার কাছে হরিশচন্দ্র নিয়োগী লেনে নিজবাড়িতে খুবই সাধারণ ভাবে থাকতেন। যাকে বলে প্রফেশনাল ক্যারিয়ার তৈরি, সেটার দিকে বাধ্য হয়ে অমনোযোগী থাকতেন। তাঁর নিজের বন্ধুরা ছিলেন সাহিত্যিক গোত্রের। নানা খুচরো কাজে প্রচুর সময় দিতে হয়েছে। ১৯৪৮-এ বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠা ও 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' মাসিক পত্রিকার শুরু তাঁর মন ও মনোযোগের অনেকটাই আকর্ষণ করেছিল। পত্রিকার সম্পাদক হয়ে তাঁর মূল লেখার স্রোত হারিয়ে গেল। এখানে খুচরো ছেলেখেলা গোছের আলগা লেখা। বিজ্ঞান সাহিত্যের তেমন কোন পরিমণ্ডল গড়ে না ওঠা।

একেবারে ছোটবেলায় গ্রামের স্কুলের যোগেন মাস্টারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাঁকে প্রবলভাবে এই কাজে উৎসাহিত করে। 'লাফানো মটরের' কাহিনি সকলের জানা। সেইখান থেকে তিনি যে দীর্ঘপথ পরিক্রমা করেছেন তাতে নিশ্চয়ই অনেক সাফল্যের মুকুট আছে। আক্ষেপের এই তাঁকে অনুসরণ করে সেভাবে কেউ এগিয়ে আসেনি। তাঁর নির্ভেজাল বৈজ্ঞানিক সত্তা, কুশলী বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপ নিশ্চয়ই গভীর অভিনিবেশের দাবি রাখে। বিজ্ঞানী দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় (শান্তিনিকেতন) তাঁর কাজের দীর্ঘ মূল্যায়ণ শেষে লিখেছেন, 'আর এইসব কারণেই জন্মশতবর্ষে গোপালচন্দ্র পুরোনো না হয়ে আমাদের কাছে হয়ে উঠেছেন ভালো একজন শিক্ষক। এমন শিক্ষক যাঁর শিক্ষার দাম সময়ের সঙ্গে বাড়ে।' (শিক্ষা ও সাহিত্য, বৈশাখ ১৪০২)। শেষ পর্যন্ত তিনি একজন 'শিক্ষক' মাত্র।

তাহলে কি গোপালচন্দ্র শেষ বিচারে মহাভারতের ট্র্যাজিক নায়ক কর্ণ?

লেখক প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, বিশিষ্ট বিজ্ঞানকর্মী, গোবরডাঙা গবেষণা পরিষদের অধ্যক্ষ ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক।

email: dipakdan@gmail.com • M. 9064757684

ছবি : শ্রীনাথ নারায়ণ

কৌ শি ক রা য়

বৃক্ষ সম্রাটের গর্বিত ভুবন

গাছটির বিজ্ঞানসম্মত নামটির মধ্যে দিয়েই বুঝতে পারা যেতে পারে গাছটির বিশালত্বকে ‘‘Sequoiadendron giganteum (সেক্যুইয়াডেন- ড্রোন জাইগান্টিয়াম)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত সিয়েরা নেভাদা পর্বতশ্রেণির পশ্চিম ঢালে, প্রায় আড়াইশো মাইল লম্বা এলাকা জুড়ে, ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে ইয়োসেমাইট জাতীয় উদ্যান এবং কিংস ক্যানিয়ন জাতীয় উদ্যানেই একমাত্র একচ্ছত্র রাজ্যপাট, বিশ্বের সবচেয়ে বড় গাছটির। “সেক্যুইয়া” বা “জেনারেল শেরম্যান” (মার্কিনী গৃহযুদ্ধ বা গেটিস-বার্গের যুদ্ধে লড়াই করা অন্যতম সেনাপতির নামানুসারে) নামক এই গাছটির উচ্চতা ২৪৭ ফিট-এ মতো। গাছটির কাছে উচ্চতায় নেহাতই শিশু ওক, পাইন, ফার, জুনিপার, রডোডেনড্রেন-এর মতো গাছগুলি। সেক্যুইয়া গাছ-এর প্রায় ৩২০০ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকার ক্ষমতা আছে। প্রায় ৫৪ হাজার ঘনফিট-এর মতো কাঠ আছে এই দৈত্যাকার গাছটির মধ্যে। গাছটির গুঁড়ির বেড় প্রায় ২৭ ফিট-এর মতো। পার্বত্য অঞ্চলের তীব্র তুষারপাত, বজ্রবিদ্যুৎ, হিমাঙ্কের নিচে শীত এবং অন্যান্য পরিবেশগত প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করে দীর্ঘকাল ধরে বেঁচে থাকার ক্ষমতা রাখে এই সেক্যুইয়া গাছটি। “সেক্যুইয়া” নামক বৃক্ষ-সম্রাটটিকে নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করেছেন হুমবোল্ট রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী স্টিভ সিলেট। তাঁর গবেষণার অন্যতম বিষয় হচ্ছে “প্রেসিডেন্ট” নামে খ্যাত একটি সেক্যুইয়া গাছ। বেশ কয়েকবার বাজ পড়েছে এই গাছটির ওপর। এর ফলে গাছটির দৈর্ঘ্য কমে দাঁড়িয়েছে ২৪৭ ফিটের মতো। তবুও প্রায় ২০ কোটি পাতা নিয়ে এই প্রেসিডেন্ট গাছটি, এখনও দৈর্ঘ্যে বেড়ে চলেছে। পুরু ছালের জন্য বিদ্যুতের ছোবল থেকে বেঁচে যায় সেক্যুইয়া। সিয়েরা নেভেদা পর্বতাঞ্চলের দীর্ঘ তুষারকাল-কে সহ্য করার ক্ষমতাও আছে এই অতিকায় গাছের। এই গাছগুলির সবচেয়ে লম্বা ডালের দৈর্ঘ্য প্রায় ৬০ ফিটের মতো। এই গাছে প্রায় সাড়ে পাঁচশোর মতো ডাল থাকে। “প্রেসিডেন্ট” এবং “জেনারেল শেরম্যান” গাছদুটিতে, মুরগির ডিমের আকারে প্রায় ৮২০০০টি বীজপত্র আছে। প্রতিটি বীজপত্রে গড়পড়তা ২০০টি বীজ থাকে। তবে মানুষের নিষ্ঠুরতার সামনে দুর্ভেদ্য নয় বিশালাকার সেক্যুইয়া গাছ। কুড়ুল-করাতের আঘাত, গত দুই শতকে বেশকিছু সেক্যুইয়া গাছের জীবন কেড়ে নিয়েছে। এমনকি, ১৯০০ সাল নাগাদ এই গাছের কেটে ফেলা বিশাল গুঁড়িগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে ফোটো

সেক্যুইয়া আশ্রিত কয়েকটি জীব

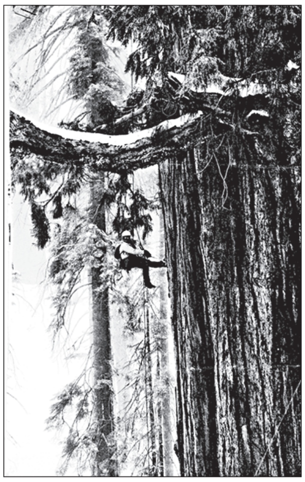

সেক্যুইয়াডেনড্রোন গাছ

তোলার প্রতিযোগিতাতে নেমে পড়ত অনেক নির্বোধ মানুষ—ঠিক যেমন দেশীয় শিকারিদের দৌলতে বাঘ মেরে তাদের মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে “বীরোচিত” ফোটো তুলতেন ভারতের ইংরেজ বড়লাট-ছোটলাটেরা। এই জঘন্য হত্যাকান্ড থেকে সেক্যুইয়া গাছগুলিকে বাঁচানোর জন্য তৈরি করা হয় ইয়োসেমাইট, কিংস ক্যানিয়ন, ক্যালাভেরাস বিগ ট্রিজ এবং সেক্যুইয়া জাতীয় প্রকৃতি উদ্যানগুলিকে। তবে, শুধুমাত্র সিয়েরা নেভাদা-র একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলেই সেক্যুইয়া গাছগুলি জন্মাচ্ছে কেন—এই রহস্যের কিনারা এখনও করতে পারেননি উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা। এছাড়া বছরের পর বছর ধরে প্রবল তুষারপাত সহ্য করার ক্ষমতা দেখিয়েও এই বৃক্ষসম্রাট নিজেই এক বিস্ময়ে পরিণত হয়েছে। সাধারণতঃ বয়স বাড়লে আমাদের হাড়ে ক্যালসিয়ামের ঘনত্বের মতোই গাছের শরীরেও কাঠের ঘনত্ব কমতে শুরু করে। এক্ষেত্রেও সেক্যুইয়া গাছেরা ব্যতিক্রম। বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাদের শরীরে কাঠের ঘনত্বও বেড়ে গেছে। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন “প্রেসিডেন্ট” গাছটিতে প্রায় ৫৪০০০ ঘনফিট-এর মতো কাঠ এবং ছাল রয়েছে। এই গাছ অনেক বেশি পরিমাণে বাতাস থেকে বিষাক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস টেনে নিয়ে আমাদের উপকার করে চলেছে। এই কার্বন-ডাই-অক্সাইডের কার্বন, সেক্যুইয়া গাছের শরীরে গিয়ে সেল্যুলোজ, হেমিসেল্যুলোজ এবং লিগনিন তৈরি করছে। এর ফলে আরও মজবুত হচ্ছে সেক্যুইয়ার “শালপ্রাংশু মহাভুজ” শরীরটি। এই সেক্যুইয়া গাছগুলির ওপর নির্ভর করে তৈরি হয়েছে এক বৈচিত্র্যময় প্রাণীজগৎও। সেক্যুইয়া গাছের পাতা, বীজ, ছাল-এর মধ্যে থাকা পোকা খেয়ে বাঁচে রবিন পাখি, “চিপমুংক” নামক কাঠবেড়ালি জাতীয় প্রাণী, কলম্বিয়ান এমারেল্ড মথ, নর্দার্ন ফ্লাইং স্কুইরেল” জাতীয় কাঠবেড়ালি, বিভিন্ন প্রজাতির শামুক, গিরগিটি, বাদুর ও মাছি। এছাড়াও সেক্যুইয়া গাছের স্নেহচ্ছায়াতে বেড়ে ওঠে “পিংক পিগমি রোজ” এবং “লিটল প্রিন্সে’স প্রাইম” নামক বুনো ফুলের গাছগুলি। পরিবেশের এই সুউচ্চ, বহুবর্ষজীবী প্রহরীর দিকে তাকিয়ে, যান্ত্রিক, দূষিত, নাগরিক সভ্যতার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বলতেই হয় কবিগুরু-র সেই অমোঘ আকুতিকে—

“দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর।”

লেখক বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক।

• *M. 9547659679*

সৌ ম্য কা ন্তি জা না

ওলকপি

পরিচিতি : বিজ্ঞানসম্মত নাম : *Brassica oleracea* Var. *gongylodes,* গোত্র : Brassicaceae। ওলকপিও দামে সস্তা হওয়ায় স্বল্প আয়ের মানুষের কাছে প্রিয় শীতকালীন সবজি। তবে বাজারে এর চাহিদা তুলনামূলকভাবে কম। অনেকেই বাজারে ওলকপিকে শালগম বলে চেনেন। দোকানদারেরাও অনেকে শালগম বলেন। তবে ওলকপি কিন্তু মোটেই শালগম নয়। শালগম হল রূপান্তরিত মূল যা খাদ্য সঞ্চয় করে স্ফীত হয়, আর ওলকপি হল খাদ্য সঞ্চয় করে স্ফীত হওয়া রূপান্তরিত কান্ড। ওদের দেখতে অনেকটা একই রকম লাগে বলে লোকে গুলিয়ে ফেলে। তাছাড়া ইংরেজিতে ওলকপিকে German Turnip বলে, যার বাংলা করলে দাঁড়ায় জার্মান শালগম। ইংরেজিতে এর আরও একটা নাম আছে---কোলরাবি (Kohlrabi)। যাইহোক, জার্মানরা ওলকপি খেতে খুবই পছন্দ করেন। উত্তর ভিয়েতনামের লোকেদেরও খুব পছন্দ ওলকপি। আর ভারতের পূর্বাঞ্চল ও বাংলাদেশের মানুষের অন্যতম শীতকালীন সবজি হল ওলকপি। সম্ভবতঃ ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকার উপকূল অঞ্চলে এর উৎপত্তি হয়। প্রাচীন গ্রিসে এই সবজি খাওয়ার প্রচলন ছিল বলে জানা যায়।

আমাদের দেশে ওলকপির বাণিজ্যিক চাষ খুব বেশি হয় না। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, জম্মু ও কাশ্মীর হল ওলকপি চাষে অগ্রণী রাজ্য। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জাতের ওলকপি হল সাটনস আর্লিয়েস্ট পার্পেল, আর্লি হোয়াইট ভিয়েনা, গোলিথ হোয়াইট, কিং অফ দ্য মার্কেট।

পুষ্টিগুণ : কপিদের পরিবারে ওলকপি খুবই ব্রাত্য সবজি। বেশিরভাগ মানুষের একটা নাক সিঁটকানো ভাব রয়েছে এই সবজি সম্পর্কে। মনে হয়, ওলকপি দিয়ে বিভিন্ন স্বাদু পদ রান্নার রেসিপি না জানা থাকাই কারণ। কিন্তু তা বলে এই সবজির গুণ মোটেই হেলাফেলা করার মত নয়। তিন প্রকার কপির মধ্যে ওলকপিতে ছিবড়ে বা ফাইবারের পরিমাণ রয়েছে সবচেয়ে বেশি। ১০০ গ্রাম কপিতে এই ছিবড়ের পরিমাণ ৩.৬ গ্রাম। আর তাই মোটাসোটা এবং কোষ্ঠকাঠিন্যে ভোগা ব্যক্তিদের জন্য ওলকপি খুবই প্রয়োজনীয় সবজি। তিনটি কপির মধ্যে ওলকপিতে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও ফসফরাস রয়েছে সবচেয়ে বেশি। এই তিনটি উপাদান হাড় ও দাঁতের অন্যতম উপাদান। দেহে শক্তি উৎপাদনের জন্য ফসফরাস খুব দরকারি মৌল। সোডিয়ামও রয়েছে অনেক বেশি। ওলকপিতে ভিটামিন-সি ও ভিটামিন-ই রয়েছে তিনটি কপির মধ্যে সর্বাধিক। যদিও রান্না করে খাওয়ার জন্য ভিটামিন-সি নষ্ট হয়ে যায়। ওলকপির পাতাও সবজি হিসেবে খুব পুষ্টিকর। এর ভেষজ গুণ বিশেষ কিছু জানা যায় না, তবে সাইপ্রাসে ক্ষুধাবর্ধক হিসেবে নুন ও লেবুর রস সহযোগে ওলকপি খাওয়ার প্রচলন রয়েছে।

লেখক বিজ্ঞানের শিক্ষক, বিজ্ঞানকর্মী ও প্রাবন্ধিক
email: janasoumyakanti@gmail.com • M. 9064202882, 9434570130

পত্রিকা যোগাযোগ ও প্রাপ্তিস্থান

স্টুডিও ইউনিক, কাঁচরাপাড়া M. 9332280602 • জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাব M. 9232387401 • পরিবেশ বান্ধব মঞ্চ বারাকপুর M. 8017402774/ 9331035550 • প্রতাপদীঘি লোকবিজ্ঞান সংস্থা M. 9732681106 • কলকাতা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা M. 9477589456 • তপন চন্দ, মাদারীহাট, আলিপুরদুয়ার M. 9733153661 • কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম M. 9434686749 • গোবরডাঙা গবেষণা পরিষৎ M. 9593866569 • জয়ন্ত ঘোষাল, নৈহাটি M. 8902163072 • কুনাল দে, ঝাড়গ্রাম M. 9474306252 • নন্দগোপাল পাত্র, পূর্ব মেদিনীপুর M. 9434341156 • উৎপল মুখোপাধ্যায়, বারাসাত M. 9830518798 • ভোলানাথ হালদার, বনগাঁও M. 8637847365, অজয় মজুমদার M. 8918824281 • শিয়ালদহ ও যাদবপুর, রানাঘাট, নৈহাটি, কল্যাণী, চাকদহ, কৃষ্ণনগর, কাঁচরাপাড়া, মদনপুর, বাদকুল্লা, চুঁচুড়া, ব্যান্ডেল স্টেশন, বৈচিত্র্য, পাতিরাম, ধ্যানবিন্দু ও মনীষা (কলেজ স্ট্রিট) • গৌতম শিরোমনি M. 7364874673 • শকুন্তলা মুখার্জী, বনগাঁও M. 8116480129, সৌম্যকান্তি জানা, কাকদ্বীপ, বামা পুস্তকালয়, M. 9434570130 • অনিশ মিত্র, দুর্গাপুর, M. 9093819373 • অরিন্দম রায়, বোলপুর, M. 7001857013 • সারথী চন্দ, শিলিগুড়ি, M. 9674031082 • উত্তম দাস, আলিপুরদুয়ার, M. 9382307460 • সবুজ পৃথিবী প্রযত্নে কোডেক্স, ৮এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯ • শান্তিপুর সায়েন্স ক্লাব, M. 9609844676/7908341942 • ক্যানিং যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা, M. 9635995476 • দীপাঞ্জন দে, কৃষ্ণনগর ও চাপড়া, M. 9734067466 • বহরমপুর রেলওয়ে বুক স্টল ও বিশ্বাস বুক স্টল, বহরমপুর বাসস্ট্যান্ড, M. 9474350231 • বাপী বুক স্টল, রামপুরহাট

তপন দাস

ছন্দ পতনেও ছিলেন ছন্দে

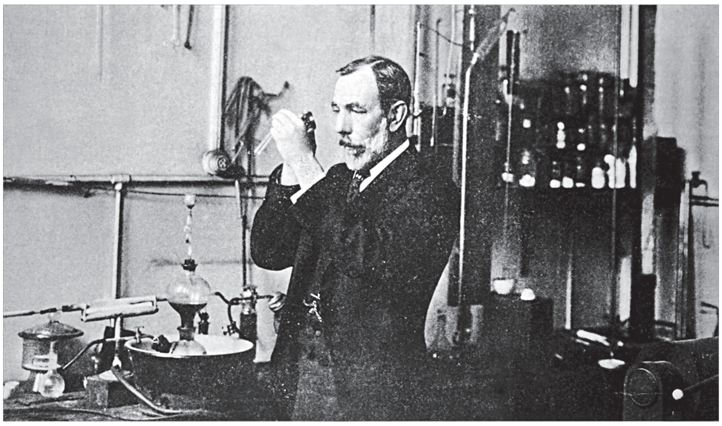

পরীক্ষাগারে কর্মরত র‍্যামস্যায়

স্কটল্যান্ডের এক ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ারের একমাত্র সন্তান র‍্যামস্যায় রসায়নবিদ হবে এই স্বপ্ন ছোটবেলাতেই দেখত। তার এই স্বপ্ন শুধুই বাস্তবায়িত হয়েছিল তা নয়। নোবেল কমিটির দেওয়া নোবেল পুরস্কারের শিরোপাও উঠেছিল তার মস্তকে। ১৯০৪ সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কার পান, আবিষ্কার করেছিলেন বিভিন্ন নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলি। স্কটল্যান্ডের গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রাজুয়েট হওয়ার পর আরও ১৮ মাস বিজ্ঞান গবেষণার বিশেষ দিকগুলো ভালোভাবে রপ্ত করেন রবার্ট টেটলকের কাছ থেকে। ১৮৭০-এর অক্টোবরে তিনি গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে জার্মানির হ্যাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের শিক্ষক রবার্ট বুনসেনের ছাত্র হিসাবে যোগ দেন। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে সেখান থেকে ছয় মাসের মধ্যে বেরিয়ে পড়েন। তারপর ডক্টরেটের ছাত্র হিসাবে যোগ দেন টুবিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ের জৈব রসায়নবিদ রুডল্ফ ফিটিগের রসায়নাগারে। ১৮৭২-এ ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন।

ফিরে এলেন গ্লাসগোতে। প্রথমে অধ্যাপনার কাজে যোগ দিলেন অ্যান্ডারসন কলেজে এবং তারপর গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেই সময় তিনি বিভিন্ন উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত জটিল যৌগ যেমন উপক্ষার (অ্যালকালয়েড) নিয়ে গবেষণা করতেন। কিন্তু ১৮৭৯ সালে তিনি আবার তার গবেষণার ক্ষেত্র পরিবর্তন করলেন। একটি তরলের স্ফুটনাঙ্কে পৌঁছানোর সময় আনব আয়তনের (Molar Volume) কিভাবে পরিবর্তন হয় সেই বিষয়ের উপর শুরু করলেন গবেষণা। ১৮৮০ থেকে ১৮৮৭ পর্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন ব্রিস্টলের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে। ব্রিটিশ রসায়নবিদ সিডলি ইয়ং-এর সাথে একত্রে গবেষণার কাজ করে প্রকাশ করলেন ৩০টি পেপার। তরল ও বাষ্পের উপর এই চর্চাই তাকে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারের পথ সুমসৃণ করেছিল। তিনি আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন বিভিন্ন নোবেল গ্যাসগুলিকে। এরপর ১৮৮৭-তে লন্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগ দিলেন এবং সেখানেই ১৯১৩ সাল পর্যন্ত থেকে কর্মজীবনের সমাপ্তি ঘটালেন। ১৮৯২ সালে তিনি হাঙ্গেরির পদার্থবিদ ইউটোভসের সান্নিধ্যে আসেন এবং তার গবেষণার ক্ষেত্রকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলেন। তিনি হয়ে উঠলেন ব্রিটেনের এক প্রখ্যাত রসায়নবিদ।

অপরদিকে ব্রিটিশ পদার্থবিদ লর্ড রেলি দেখালেন যে কোন যৌগ থেকে প্রাপ্ত নাইট্রোজেনের পারমাণবিক ভর বায়ু থেকে প্রাপ্ত নাইট্রোজেনের পারমাণবিক ভর অপেক্ষা কম হয়। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে র‍্যামস্যায় দেখালেন যে বায়ু থেকে প্রাপ্ত নাইট্রোজেনে মিশে আছে একপ্রকার মনোএটোমিক নিষ্ক্রিয় গ্যাস। এরা দুজনে যৌথভাবে ঘোষণা করলেন বায়ুতে আয়তন হিসাবে প্রায় ১ শতাংশ নিষ্ক্রিয় গ্যাস বর্তমান। এর নাম দিলেন আর্গন। যদিও পরবর্তীকালে রসায়নবিদ মরিসের সঙ্গে কাজ করে দেখালেন এই গ্যাস মিশ্রণে আর্গনের সাথে আছে নিয়ন, ক্রিপটন ও জেনন। ক্লিভেইট নামক একপ্রকার খনিজ থেকে নিষ্কাশন করলেন হিলিয়াম। ১৯০৩-এ ফ্রেডরিক সডির সাথে একত্রে গবেষণায় দেখালেন রেডিয়াম থেকে হিলিয়াম উৎপন্ন হয় তেজস্ক্রিয় ভাঙনের ফলে। ১৯১০-এ তিনিই প্রতিষ্ঠা করলেন ষষ্ঠ নিষ্ক্রিয় মৌলটি হল রেডন।

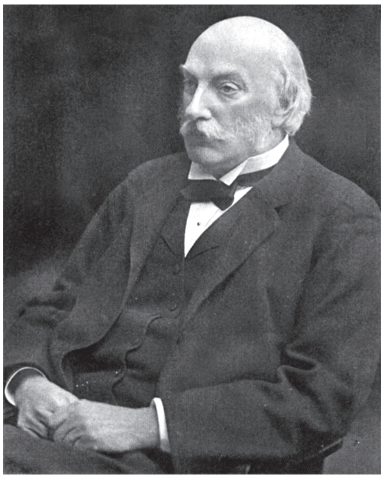

লর্ড রেলিগ

ফ্রেডরিক সডি

বায়ুতে মিশ্রিত নোবেল গ্যাসগুলিকে আলাদা করার জন্য রাসায়নিক ও প্রাকৃতিক দুটো পদ্ধতিই প্রয়োগ করা হয়। প্রথমে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, জলীয়বাষ্প ধূলিকণা মুক্ত করে রাসায়নিক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসকে আলাদা করা হয় এবং পরে বিভিন্ন তাপমাত্রায় অধিশোষণের উপর ভিত্তি করে উপাদানগুলিকে আলাদা করা হয়।

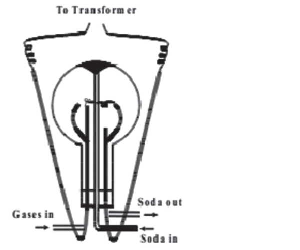

Chemical method for isolation of noble gases

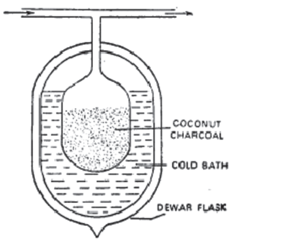

Separation of noble gases (Dewar's method)

নোবেল গ্যাস পৃথকীকরণ

প্রথম ধাপ : র‍্যামস্যায়-রেলি প্রথমে ৫০ লিটার আয়তনের একটি কাচের গ্লোব বাতাস ও অক্সিজেন দিয়ে পূর্ণ করেন। গ্লোবে দুটি প্ল্যাটিনাম তড়িৎদ্বার যুক্ত করে ৬০০০-৮০০০ ভোল্ট-এ তড়িৎ ক্ষরণ করা হয়। ফলে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন যুক্ত হয়ে নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড উৎপন্ন হয়। এই অক্সাইডগুলোকে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণে দ্রবীভূত করে আলাদা করা হয়। পড়ে থাকে শুধুমাত্র নোবেল গ্যাস মিশ্রণ।

দ্বিতীয় ধাপ (ডিওয়ার পদ্ধতি) : নোবেল গ্যাসের উপাদানগুলি উদ্ভিজ্জ অঙ্গারে উষ্ণতার তারতম্যে ভিন্নভাবে অধিশোষিত হয়। দুই দেওয়াল যুক্ত একটি বিশেষ পাত্রে 173K তাপমাত্রায় গ্যাস মিশ্রণকে রাখা হলে আর্গন, ক্রিপটন ও জেনন অধিশোষিত হয়। কিন্তু হিলিয়াম ও নিয়ন হয় না। ফলে এই দুই গ্যাসকে পাম্পের মাধ্যমে আলাদা করা হয়। পরে 93K তাপমাত্রায় অঙ্গারের সংস্পর্শে শুধুমাত্র হিলিয়াম অধিশোষিত হয় এবং নিয়নকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করা হয়। 173K তাপমাত্রায় অধিশোষিত মিশ্রণকে তরল বায়ুর তাপমাত্রায় অন্য একটি অঙ্গারের সংস্পর্শে আনলে শুধুমাত্র আর্গন ব্যাপিত হয়ে আলাদা হয়। অবশিষ্ট অংশে থাকে ক্রিপটন ও জেনন। 183K তাপমাত্রায় অঙ্গার থেকে ক্রিপটন বেরিয়ে আসে এবং আরও তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে জেনন নিষ্কাশিত হয়।

এইভাবে প্রাপ্ত নোবেল গ্যাসগুলি দীর্ঘ পর্যায়সারণিতে ১৮ নম্বর শ্রেণিতে অবস্থান করে। ১৮৫২ সালের ২ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করে শিক্ষাজীবনের শুরুতে যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন তাকে বাস্তবায়ন করলেন। ঘটল অনেক ছন্দপতন আবার ফিরলেন ছন্দে। প্রবহমান জীবনে অনেক বাঁক পরিবর্তন করলেন। লক্ষ্য নির্দিষ্ট থাকায় শীর্ষে পৌঁছলেন সহজেই। ১৯১৬ সালের ২৩ জুলাই চলে গেলেন না ফেরার দেশে। প্রতিটি বাঁকে রেখে গেলেন তার পদচিহ্ন।

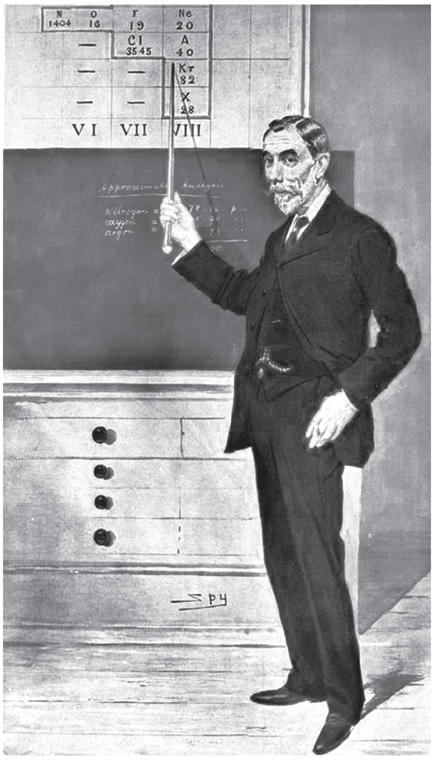
র‍্যামস্যায়

লেখক রসায়নের শিক্ষক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক।

email: tdcob25@gmail.com • M. 8944996755

বার্ট্রান্ড রাসেল

এই হল বিজ্ঞান

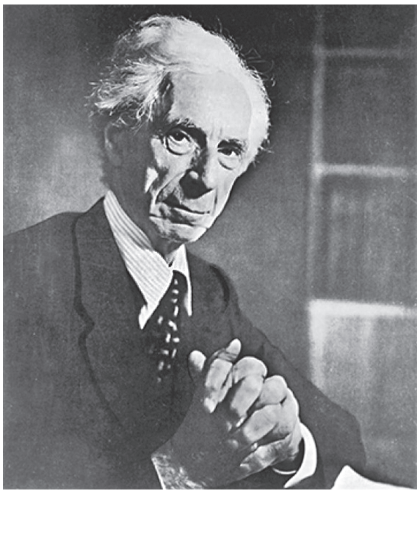

বিজ্ঞানই ডাকিনীবিদ্যা, জাদুবিদ্যা আর কালাজাদুর বিনাশ ঘটিয়েছে। এই বিজ্ঞানই প্রাচীন বিশ্বাস আর পুরোনো কুসংস্কারগুলোকে বুদ্ধিমান মানুষের পক্ষে গ্রহণ করার অযোগ্য করে তুলেছে। পৃথিবীকে মহাবিশ্বের কেন্দ্র বলে মনে করাকে আর মানবজাতিকেই সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য বলে ধরে নেওয়াকে হাস্যাস্পদ করে তুলেছে বিজ্ঞানই। এই বিজ্ঞানই আত্মা এবং শরীরের, মন এবং বিষয়ের দ্বৈতবাদের সেইসব প্রাচীন ধারণার অসত্যকে প্রকাশ করে দিয়েছে, যার উৎসস্থল ধর্ম। আমাদের নিজেদের উপলব্ধি করতে শেখাতে শুরু করেছে এই বিজ্ঞানই, আর এই বিজ্ঞানই একটা নির্দিষ্ট জায়গা অবধি আমাদের নিজেদেরকে বাইরে থেকে এক কৌতূহলোদ্দীপক প্রক্রিয়া হিসেবে দেখার দৃষ্টি দিয়েছে। বিজ্ঞানই আমাদের নিশ্চিত মিথ্যের বিকল্প হিসেবে অনিশ্চিত সত্যকে গ্রহণ করতে শিখিয়েছে।

দিগন্ত পাল

ব্রেইন ফ্রীজ

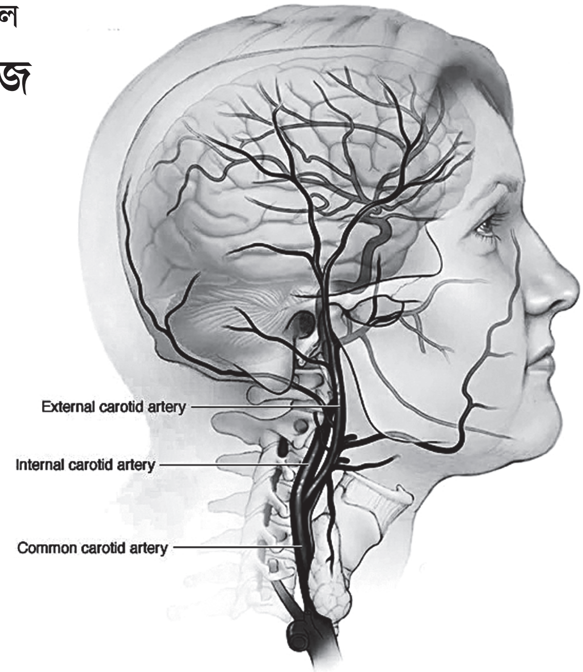

ক্যারোটিড ধমনী

তপ্ত গ্রীষ্মকালে কিছু অনুভূতি সত্যিই আরামপ্রদ—যেমন ঠান্ডা আইসক্রীম-এর স্বাদ। কিন্তু লক্ষ করে দেখবে যে, খুব ঠান্ডা বরফ বা আইসক্রীম খুব তাড়াতাড়ি মুখে নিলে মাথা ঝনঝন করে ওঠে। স্নায়ুবিজ্ঞানে আলোচিত এই ঘটনাই সাধারণ মানুষের কাছে 'ব্রেইন ফ্রীজ' নামে পরিচিত।

মা-বাবা বা বড়রা আমাদের সব সময়ই ধীরে-সুস্থে ভালভাবে চিবিয়ে খাবার খাওয়ার পরামর্শ দেন কারণ তা আমাদের খাওয়া খাবার হজমে সহায়ক হয়। খুব ঠান্ডা খাবার দ্রুত খেতে গেলে মাথা ঝনঝন করে ওঠা হল সেরকমই এক নিষেধাজ্ঞা যা সরাসরি আসে আমাদের মস্তিষ্কের কাছ থেকে, তবে এই বারণের সাথে হজমের কোন সম্পর্ক নেই। আসলে আমাদের মস্তিষ্ক যে কোন বিষয়ের খুব দ্রুত পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারে না। খুব ঠান্ডা বরফ বা আইসক্রীম তাড়াতাড়ি মুখে নিলে মুখগহ্বরের উষ্ণতা দ্রুত হারে কমে—যার ফলে আমাদের মস্তিষ্কের প্রতিক্রিয়াও অস্বাভাবিক হয়। মুখে দ্রুত আইসক্রীম নিলে মস্তিষ্কের এই অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া কিভাবে ঘটে তার বৈজ্ঞানিক ধাপগুলো বুঝতে গেলে আমাদের মানুষের রক্ত-সংবহন তন্ত্র ও স্নায়ুতন্ত্র সম্পর্কে কিছু বিষয় জেনে রাখতে হবে।

প্রথমে রক্ত-সংবহন তন্ত্রের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো জেনে নিই। আমাদের ঘাড়ের বামদিকে একটি বাম ক্যারোটিড ধমনী ও ডানদিকে একটি ডান ক্যারোটিড ধমনী থাকে। ভেবে দেখো যে ভ্যাম্পায়ার বা জম্বি সংক্রান্ত আতঙ্কের চলচ্চিত্রে দেখানো হয় যে তারা মানুষের ঘাড় কামড়ে রক্ত শোষণ করে। এর পেছনেও একটা বৈজ্ঞানিক কারণ আছে আর তা হল যে ঘাড় কামড়ে সহজেই অনেক বেশি পরিমাণে অক্সিজেন

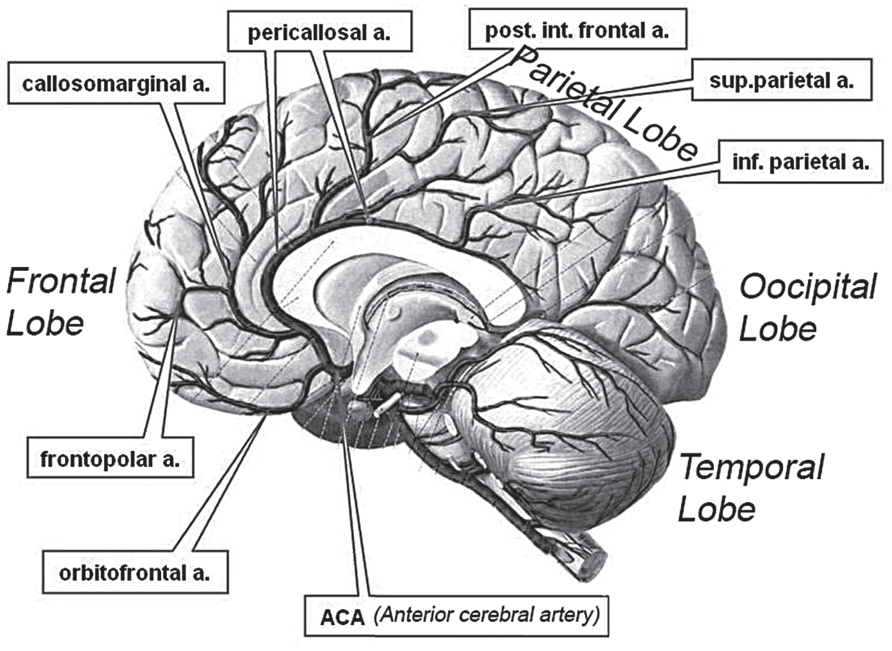

মস্তিষ্ক ও অ্যান্টেরিয়ার সেরিব্রাল ধমনী

সমৃদ্ধ রক্ত শোষণ করে নেওয়া যায় যা সম্ভব হয় বাম ও ডান ক্যারোটিড ধমনীর উপস্থিতির জন্যই। আমরা জানি যে ধমনীর প্রতিটিই দুটি করে শাখাধমনীতে বিভক্ত হয়—ইন্টারনাল বা আভ্যন্তরীণ

ক্যারোটিড ধমনী ও এক্সটারনাল বা বাহ্যিক ক্যারোটিড ধমনী। আভ্যন্তরীণ ক্যারোটিড ধমনী মস্তিষ্কে বিশুদ্ধ রক্ত পৌঁছে দেয় এবং বাহ্যিক ক্যারোটিড ধমনীর মাধ্যমে মুখমন্ডল ও ঘাড়ে বিশুদ্ধ রক্ত সরবরাহ হয়। আভ্যন্তরীণ ক্যারোটিড ধমনী কিছু শাখা-ধমনীতে বিভক্ত হয়ে সমগ্র মস্তিষ্কে অক্সিজেন সমৃদ্ধ বিশুদ্ধ রক্ত ছড়িয়ে দেয়। এদের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা ধমনী হল আন্টেরিয়া সেরিব্রাল ধমনী যা মস্তিষ্কের ফ্রন্টাল লোব ও সুপিরিয়র প্যারাইটাল লোবের একদম মধ্যভাগে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত নিয়ে যায়।

সময় এসেছে মানুষের স্নায়ুতন্ত্র সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক কয়েকটি দরকারি বিষয় জেনে ফেলার। শুরুটা মস্তিষ্কের ঐ দুটি অংশ—'ফ্রন্টাল লোব' ও 'সুপিরিয়র প্যারাইটাল লোব' দিয়েই করা যাক। ফ্রন্টাল লোব হল মস্তিষ্কের অগ্রভাগে অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যা মানুষের আবেগপ্রবণ অভিব্যক্তি, সমস্যার সমাধান, স্মৃতি, ভাষা, বিচার ও

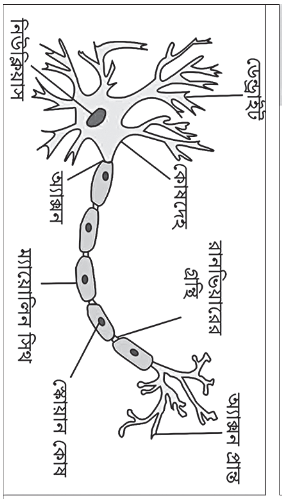

নিউরন

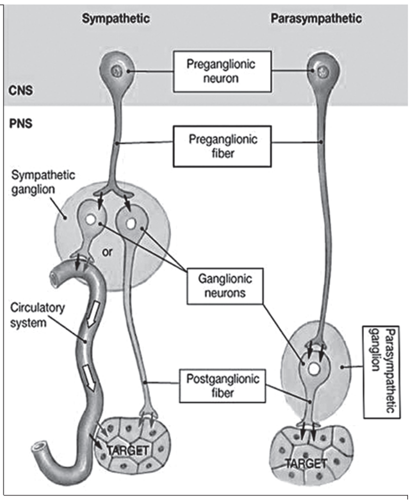

গ্যাংলিয়ন

বিবেচনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। আর সুপিরিয়র প্যারাইটাল লোব অংশটি প্রধানত আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে চারপাশের পরিবেশ এবং সেই পরিবেশ সাপেক্ষে আমাদের নিজেদের অবস্থান ও গতির ধারণা রাখতে সাহায্য করে।

মস্তিষ্ক সহ মানুষের সমগ্র স্নায়ুতন্ত্র তৈরি হয় বহু স্নায়ুকোষ বা নিউরোন নিয়ে। স্নায়ুকোষ-এর একটি সরু সুতোর মতো অংশ থাকে যাকে 'অ্যাক্সন' বলে ও স্নায়ুকোষের গোলকাকার অংশটি যেখানে নিউক্লিয়াস থাকে তা 'কোষ-দেহ' বা 'সেল বডি' বা 'সোমা' নামে পরিচিত। অনেক ক্ষেত্রে বেশ কিছু স্নায়ুকোষ দল বেঁধে থাকলে তাদের কোষ-দেহগুলি জটলা করে এক-একটি বিশেষ অংশ তৈরি করে যাকে 'গ্যাংলিয়ন' বলে। খুব সুস্বাদু খাবার দেখে বা গন্ধ শুঁকে জিভে জল চলে এসেছে এমন ঘটনা বোধকরি তোমাদের সাথে বহুবার ঘটেছে। এর জন্য দায়ী এক বিশেষ ধরনের গ্যাংলিয়ন যাদের 'প্যারাসিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ন' বলে। 'স্ফেনোপ্যালেটাইন' হল এমনই একটি প্যারাসিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ন যে পূর্বোক্ত বাহ্যিক ক্যারোটিড ধমনীর মধ্যে রক্ত প্রবাহের হারকে বাড়িয়ে বা কমিয়ে মুখমন্ডল (অর্থাৎ নাসাগহ্বরের আভ্যন্তরীণ

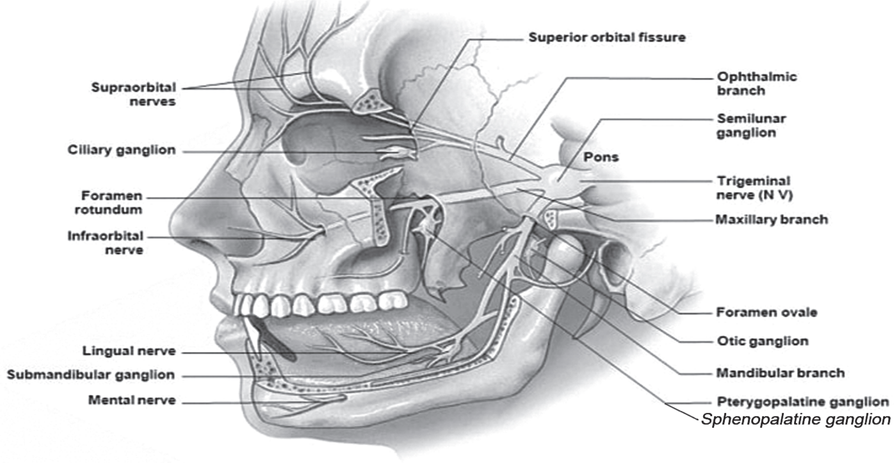

মাথায় প্যারাসিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ন

প্রাচীর, মুখগহ্বরের ছাদ, নাসাগহ্বরকে ঘিরে থাকা চার জোড়া সাইনাস ইত্যাদি) ও ঘাড়ের তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে।

খুব ঠান্ডা আইসক্রীম তাড়াহুড়োয় খেলে, মস্তিষ্ক কিভাবে আমাদের থামাতে তৎপর হয় তার ব্যাখ্যা এখন আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। আইসক্রীম বা কুল্ফির মতো ঠান্ডা খাদ্য রয়েসয়ে না খেলে, স্ফেনোপ্যালেটাইন গ্যাংলিয়ন মুখগহ্বরের ছাদের তাপমাত্রা দ্রুত কমানোর জন্য সেখানে রক্তপ্রবাহের হার খুব দ্রুত কমিয়ে দেয়। ফলে বাহ্যিক ক্যারোটিড ধমনীর মধ্যে রক্তপ্রবাহের হার খুব দ্রুত কমে। হৃৎপিন্ড থেকে বাম বা ডান ক্যারোটিড ধমনীর মধ্য দিয়ে বয়ে আসা রক্তপ্রবাহই বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ ক্যারোটিড ধমনীতে বিভক্ত হয়, তাই বাম বা ডান ক্যারোটিড ধমনীর মধ্যে রক্তপ্রবাহের হার একই রেখে যখন বাহ্যিক ক্যারোটিড ধমনীর মধ্যে রক্তপ্রবাহের হার খুব দ্রুত কমে, তখন আভ্যন্তরীণ ক্যারোটিড ধমনীতে বিশেষত তার শাখা অ্যান্টেরিয়া সেরিব্রাল ধমনীর মধ্যে রক্তপ্রবাহ খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে চলে। ফলস্বরূপ, মস্তিষ্কের ফ্রন্টাল লোব ও সুপিরিয়র প্যারাইটাল লোবের মধ্যভাগে রক্ত সরবরাহের হার হঠাৎ খুব বেড়ে যায় যা মুহূর্তের জন্য মাথায় তীব্র ব্যথার কারণ।

স্নায়ুপথের যেকোন ব্যথাকে স্নায়ুবিজ্ঞানের ভাষায় 'নিউরালজিয়া' বলা হয়। আমাদের আলোচিত ব্যথা অর্থাৎ 'ব্রেইন ফ্রীজ'-এর কারণ হিসাবে স্ফেনোপ্যালেটাইন গ্যাংলিয়ন-র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য এই ব্যথার অপর নাম 'স্ফেনোপ্যালেটাইন গ্যাংলিওনিউরালজিয়া'।

একইরকম ভাবে খুব গরম হাওয়া ঘাড় বা মুখমন্ডলে স্পর্শ করে গেলে বা ঘরের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় অনেকক্ষণ থাকার পর খুব শীঘ্র বাইরে কাঠ ফাটা রোদ্দুরে বেরিয়ে গেলে মুহূর্তের জন্য মাথা ধরে যায় কারণ স্ফেনোপ্যালেটাইন গ্যাংলিয়ন ঘাড় বা মুখমন্ডলে রক্তপ্রবাহের হার খুব দ্রুত বাড়িয়ে দেয়। গরমে মাথা ধরে যাওয়ার বাকি ব্যাখ্যাটা এখন নিজেই করার চেষ্টা করুন।

লেখক তথ্যপ্রযুক্তি পেশাদার ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক।

email:digantapaul5@gmail.com. • 9874556152

অসিত ঘোষ

নিকোলা টেসলা : বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ যিনি একক মহিমায় মডেল

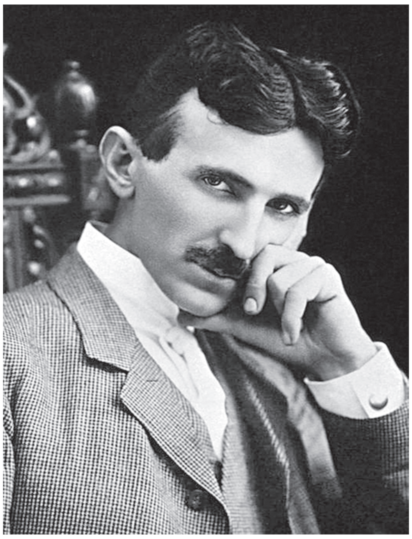

সে এক বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির রাত। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দ, ১০ জুলাই; অন্যমতে ৯ জুলাই। ক্রোয়েশিয়ার স্মিলজান শহরে জন্ম হয়েছিল মানুষটির, যে তার জীবনভর অধ্যবসায় আর বিজ্ঞান গবেষণার চৌহদ্দিতে আত্মনিয়োগ করে আবিশ্বকে যা উপহার দিয়ে গেছেন, বর্তমান যুগে হয়তো-বা, আবহমান কাল ধরে সেগুলি একইভাবে সমাদৃত থাকবে। নামের মাহাত্ম্যে নয়, তিনি বিজ্ঞানের ইতিহাসে পরিচিত এক নাম, নিকোলা টেসলা। ঊনবিংশ শতাব্দিব্যাপী নিরলস প্রচেষ্টায় তাঁর প্রতিভার সফল বিকাশ ঘটে এবং একজন বিজ্ঞানসাধক, উদ্ভাবক, বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ হিসাবে সমাজের সমস্তক্ষেত্রে, এমনকি নিন্দুকদেরও নজর কাড়তে থাকেন। বলা চলে, তাঁর আবিষ্কারগুলি আজকে একবিংশ শতকের এক-চতুর্থাংশের দোরগোড়ায় এসে, নানা অবিস্মরণীয় উদ্ভাবকের খেতাব জয়ে, প্রথম সারির বরেণ্য বিজ্ঞানীদের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন। তবুও নোবেল পুরস্কার তাঁর ভাগ্যে শিকে ছেড়েনি। যেমনটা আমাদের দেশে বিজ্ঞানী— প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা এবং অমলকুমার রায়চৌধুরি কেউই নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী হননি। অথচ বিশ্বজোড়া এঁদের প্রতিভা সর্বজনস্বীকৃত স্মরণ করছি সঙ্গত কারণেই, বাঙালি হিসাবে কিছু আত্মশ্লাঘা বোধ করছিল, পাঠক দোষ ধরে বসবেন না। যাই হোক ফিরে আসি, বিজ্ঞানী টেসলা প্রসঙ্গে। বিজ্ঞানী কেবল নয়, একাধারে ভাষাবিদ। ১৮টি ভাষা জানতেন আর তাঁর নামে পেটেন্টের ছড়াছড়ি, কমবেশি ৭০০টি হবে। আর পেটেন্ট নেই এমন উদ্ভাবনও কম নয়। কয়েকটির নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়। বিপরীতমুখী প্রবাহ (A.C.), মুক্ত শক্তি (Free Energy) আধান, তারবিহীন বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবসা, রাডার প্রযুক্তি ছাড়া যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রকৌশল সজ্জা ইত্যাদি তাঁর উল্লেখ্য প্রতিভার ও পারদর্শিতার অংশবিশেষ। তবুও তিনি ছিলেন একজন অবহেলিত বিজ্ঞানী। ১৮৮০ সালে পকেটে মাত্র চার পেনি নিয়ে আমেরিকায় চলে আসেন। ১৮৯১-তে এই মহান বিজ্ঞানী আমেরিকার নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য আবেদন করেন। সেখানে দীর্ঘ এগার বছরে নিরলস কাজে একের পর এক উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানের ভিত শক্তপোক্ত করে এক অনন্য উচ্চতায় বিজ্ঞানকে তিনি নিয়ে ফেলেছিলেন যার কয়েকটি বিষয়ে ধীরে ধীরে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আসব। তিনি গবেষণা করেছেন নোবেল পদার্থবিজ্ঞানী আলভা এডিসনের সাথে। তাঁর আবিষ্কৃত এ.সি. মেশিন বনাম এডিসনের ডি.সি. মেশিন সেইসময় 'ইলেকট্রিক যুদ্ধ' নামে চলতিভাষায় পরিচিত ছিল। টেসলা কেবল বিজ্ঞানী না, একজন সংস্কারকও বটে— উচ্চমাপের বিরল ব্যক্তিত্ব বলা চলে। এককথায় তিনি ছিলেন সময়ের দূত। একশো বছর আগে বলেছিলেন, 'এমন এক সময় আসবে যখন সংবাদ, মাঠের খেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও চলচ্চিত্র তারবিহীন পদ্ধতিতে ঘরে বসেই দেখা যাবে। বিদ্যুৎ পরিবহন ব্যবসার (Eleectricity Supplying System) জনক তাই তাঁকে বলাও হত। আপাত একটা বিষয় উল্লেখ করছি, নিকোলা টেসলার নামানুসারে চুম্বক প্রাবল্যের ঘনত্ব (magnetic flux density)-কে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল। একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রয়োজন যা একটু পরে আসছি। ইঞ্জিনিয়ারিং বা প্রযুক্তি বিদ্যায় উচ্চতর পড়াশুনার সাথে কিছুদিন উন্নতমানের প্রশিক্ষণ নিয়ে তিনি ইতিমধ্যে অস্ট্রেলিয়ার গ্রাজ (Graz) শহরে গামা রশ্মির ব্যবহারে জেনারেটর চলছে দেখেন। সহজলভ্য 'ইলেকট্রিক মোটর' আবিষ্কারের চিন্তা তাঁর মাথায় আসে। তখনকার দিনে বিপরীতমুখী চলতড়িৎ প্রবাহের তখনই প্রচলন সমাজের ব্যাপক অংশের উদ্দেশ্য ছিল। তাঁর এ.সি.মোটর আবিষ্কার প্রসঙ্গে আলোচনার আগে চৌম্বকীয় ঘটনা ও চৌম্বক পদার্থের ধর্ম সম্পর্কে প্রাচীন ধারণা তাঁর সময়ের আগের বিজ্ঞানীদের এই বিষয়ে গবেষণার অগ্রগতির কথা সংক্ষেপে আলোচনা প্রয়োজন।

ডেনমার্কের বিজ্ঞানী অধ্যাপক হানস ক্রিশ্চিয়ান ওরস্টেড ১৮২০ সালে, 'পরিবাহী তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হলে চৌম্বকক্ষেত্র সৃষ্টি হয় যা একটি চৌম্বক শলাকাকে বিক্ষেপ করতে পারে', ইতিমধ্যে আবিষ্কার করেছেন। এই ঘটনার ঠিক বারো বছর পর, ১৮৩২ সালে মাইকেল ফ্যারাডে (Michael Faraday) দেখান, 'কোন তড়িৎ বর্তনীতে চৌম্বকক্ষেত্রের পরিবর্তন ঘটালে ক্ষণস্থায়ী প্রবাহমাত্রায় আবিষ্ট হয়'। এই ঘটনা দুটির পরম্পরা থেকে বিজ্ঞানী টেসলার কাছে স্পষ্ট হয় 'তড়িৎপ্রবাহ' এবং 'তড়িৎচৌম্বকত্ব' (Electro-magnetism) কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, যা বুদাপেস্টে গিয়ে চৌম্বকক্ষেত্রের এক ঘূর্ণনের ঘটনায় ইলেকট্রিক মোটরের ক্ষেত্রে তড়িৎচৌম্বকীয় আবেশের ব্যবহারিক প্রয়োগ পর্যবেক্ষণ করেন। পরিবাহী তারের ভেতর দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ বা গতিশীল আধানের দরুন এক চৌম্বকক্ষেত্র সৃষ্টি হয় এই ঘটনা চাক্ষুষ করে বিজ্ঞানী বায়ো ও স্যাভার্ট (Biot and Savart) তাঁদের পরীক্ষায় ক্ষুদ্র প্রবাহ উপাদানের কোন বিন্দুতে চৌম্বকবল সৃষ্টির একটি সূত্র প্রস্তাব করেন যা বিজ্ঞানী টেসলা ভিন্নাকারে প্রকাশ করেন। সেটি হল— পরীক্ষণীয় আধান (এক্ষেত্রে ধরি ধনাত্মক আধান) একটি জড়ত্বীয় ফ্রেমের সাপেক্ষে গতিশীল হলে একপ্রকার বল অনুভব হয়, উহা আধানের গতিবেগের সমান্তরাল হলে কেবল চৌম্বকক্ষেত্র সৃষ্টি হয়, চুম্বকবল আর থাকবে না। এই ধারণা বিজ্ঞানসমাজে তিনি প্রথম হাজির করেন। 'জড়ত্বীয় ফ্রেম সাপেক্ষে গতিশীল আধান সমান্তরাল সরলরেখা বরাবর থাকলে চুম্বক বিক্ষেপ সৃষ্টির ঘটনা তিনিই প্রথম বলেন। বিজ্ঞানী টেসলার এই অবদানের জন্য চৌম্বকক্ষেত্রের আন্তর্জাতিক একক (SI unit)-কে টেসলা (T) নামকরণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, উল্লেখ্য

টেসলার ও তার অসংখ্য আবিষ্কারের মধ্যে কয়েকটির সংকলিত চিত্র

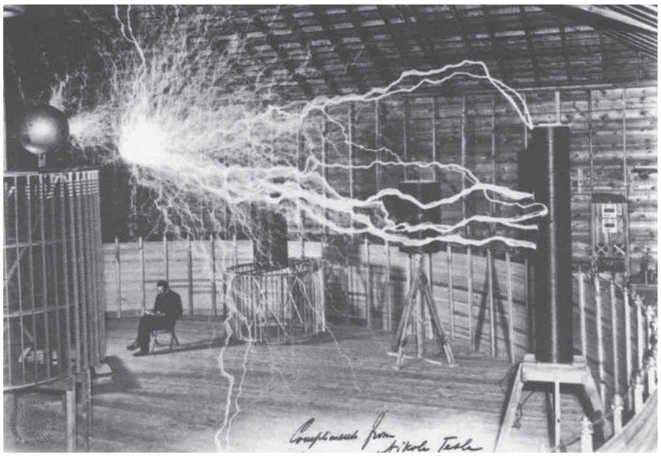
পরিবেশে নাইট্রোজেনের তপ্ত দীপ্তি। ১৮৯৯।

উচ্চ ভোল্টেজ ও স্পন্দনে পরীক্ষা

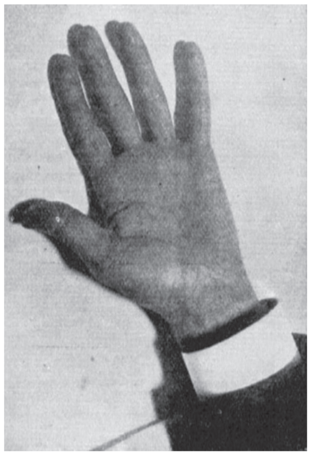
টেসলার আবিষ্কৃত কৃত্রিম আলোয় তার হাতের ছবি

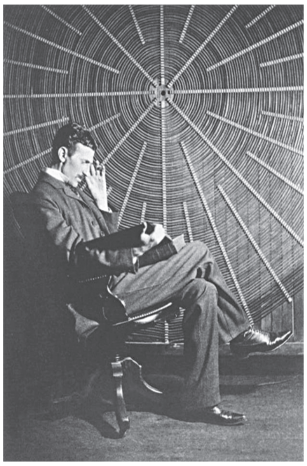
টেসলার ও উচ্চ স্পন্দনে পেঁচানো তারের ট্রান্সফর্মার

টেসলার ও তাঁর আবিষ্কৃত টেসলার কুণ্ডলী ১৮৯৬

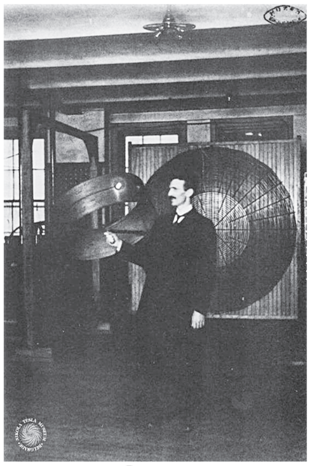
তারবিহীন ক্ষমতা প্রবাহে

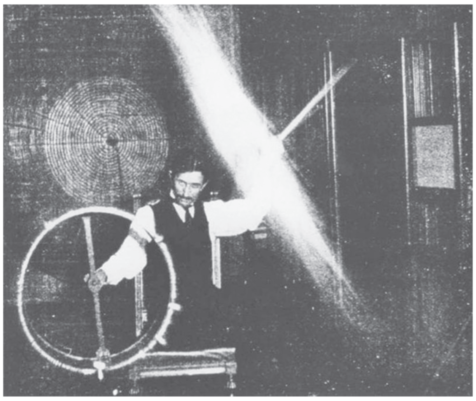
পরীক্ষারত টেসলার

টেসলারের পরীক্ষাগার

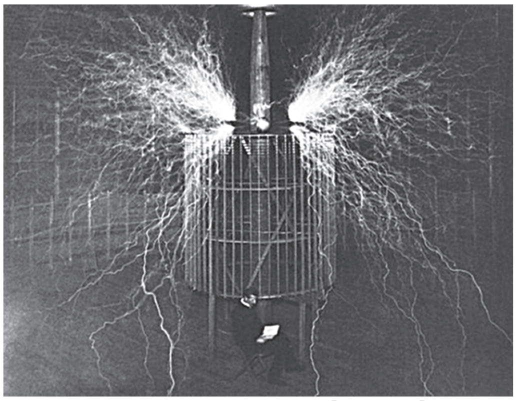
১৫০০ ক্যান্ডেল ক্ষমতার বায়ু শূন্য বাল্ব দিয়ে আলোকিত করা

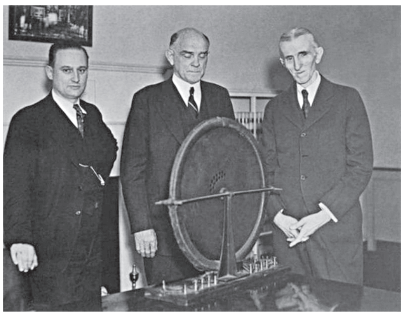
অন্য সাথীদের সাথে তাঁর আবিষ্কারের সামনে

চেকস্লোভাকিয়া প্রদত্ত পুরস্কার গ্রহণ

দপ্তরে কর্মরত টেসলার

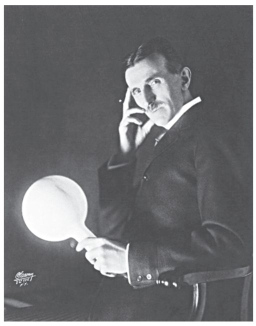
তারবিহীন আলোকিত বাল্ব

ঘটনার প্রয়োগে সেইসময়ে আধুনিক মোটরের উদ্ভাবন সমগ্র ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমহলে ব্যাপক সাড়া ফেলে দেয়। ১৮৮২-তে কন্টিনেন্টাল এডিশন কোম্পানির সহায়তায় প্যারিস থেকে 'সেসবার্গে গিয়ে 'ইন্ডাকশান মোটর' তৈরি করেন। বিশেষত্ব হল— মোটরে যে পরিবাহী কুন্ডলীর ব্যবহার হচ্ছে সেটির কৌশলগত অভিনবত্ব ও কার্যক্ষমতা অনেক বেশি। ফলে বাজারে এর চাহিদা বেড়ে যায় অপরদিকে কালবিলম্ব না করে পেটেন্ট পেতে দরখাস্ত পেশ করেন। বলাবাহুল্য আজকের দুনিয়ায় রেডিও, টিভি সেট এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিক ব্যবহারিক যন্ত্রপাতিতে টেসলা কুন্ডলী ব্যবহার হচ্ছে। যাইহোক, ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর কপাল খুলে যায়। আমেরিকায় নাগরিকত্ব এবং 'টেসলা কুন্ডলী (Tesla Coil) পেটেন্ট লাভ একইসঙ্গে ঘটে। বিশেষভাবে বলতেই হবে তাঁর এই উদ্ভাবনের বিশেষত্ব ছিল, তড়িৎশক্তির অপচয় রোধ, ও স্থান সংকুলান (Space Economy) ব্যবসা। এই রকম অমিত পরিশ্রমে ৭০০-র মত কমবেশি পেটেন্ট তাঁর বিষ্ময়কর আবিষ্কারের জন্য রয়েছে। আর পেটেন্ট নেই এমন উদ্ভাবনও কম নয়। উল্লেখিত হলেও তবে তা হোল এক অন্য গল্প। আসলে বিজ্ঞানীকে যত কঠিনতর জীবনের মুখোমুখি হতে হয়েছিল ততই পরীক্ষা, গুপ্ত শত্রুতা, অবজ্ঞা, পাহাড়সম বাধা ও অকুলপাথার অনেকানেক অতিক্রম করেই উন্নতির শিখরে উঠতে হয়েছিল, যা উপকথা মত বললেও বেশি হবে। বিজ্ঞানে, ব্যক্তিগত ভাবনার আলোকময় পরিসর সমাজকে দিতে পারেন যিনি, তিনিই বিজ্ঞানী, যাঁর মেধা ও সাহসের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিশির ডাকে গলে না। আবার বললে দোষের হবে না সমস্যার তো শেষ নেই, প্রশ্ন হলো তার সমাধান আসবে কোনপথে? মাথা খাটিয়ে একাগ্রতায় অবশেষে আবিষ্কার করেন টেসলার মতো বিজ্ঞানী ব্যক্তিরা, সমাধানের আশ্চর্য জাদুকাঠি তাই-ই। এদিকে, ১৮৮৮-র মে—পিটসবার্গের ওয়েস্টিং হাউস কোম্পানিতে চাকরিসহ গবেষণার কাজে থাকাকালীন টেসলা বহুমুখী এসি ডায়নামোর, ট্রান্সফর্মার এবং মোটর উদ্ভাবনের জন্য পেটেন্ট পায়। চলতি সময়ে বিজ্ঞানী এডিসনের একমুখী ডায়নামো বহুল ব্যবহার ছিল। বহুমুখী ডায়নামো ক্ষেত্রে উচ্চস্তরের কার্যকারিতা ও গুণগত মান উত্তম; ফলে তাঁর দেখানো নতুন আলোকময় পরিসর সমাজকে প্রভাবিত করলেও তুলনায় অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ও সম্ভাবনাহীন বস্তুর আবিষ্কারকের সংঘাতের মুখোমুখি হয়ে অনিয়ন্ত্রিত অস্থিরতায় ভুগতে হয়েছিল; এভাবে দিন যায়, বছর ফুরায়। একদিন টেসলাকে এডিসনের ল্যাবরেটরি থেকে পত্রপাঠ বিদায় নিতে হোল এবং দ্রুত নিজস্ব ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিল যেখানে গবেষণার ক্ষেত্রে স্বাধীন সত্তা বিকাশের সুযোগ পান। টেসলার অন্তহীন পরীক্ষার মধ্যে একটি carbon button lamp যেখানে বৈদ্যুতিক শক্তির অনুরণনের ফলে নানা বর্ণে আলোকসজ্জা প্রতিভাত হওয়ার ঘটনা যা ১৮৯৩ সালে চিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্ববাণিজ্য মেলায় প্রদর্শিত হয়েছিল। ওয়েস্টিং হাউস কোম্পানি এই আবিষ্কারকে ব্যবহার করে নাইজিরিয়া জলপ্রপাতের জন্য বিদ্যুৎচালিত যন্ত্র বসানোর ব্যবসাপত্র পেয়েছিল। তারবিহীন ব্যবসায় ২০০টি ল্যাম্প পরপর সাজিয়ে ৪০ কিমি. দূরত্বে ৪১মি. (১৩৫ ফুট) উচ্চতায় আলোরমালা সৃষ্টি করা যায় দেখিয়ে, এধরণের প্রকল্প নির্মাণের জন্যে অনন্য নজির সৃষ্টি হয় এবং ১৮৯৬-তে আরো একটি পেটেন্ট পান। একে একে রিমোট কন্ট্রোল টেলি স্বয়ংক্রিয় বোট (১৮৯৮), terrestrial stationery wave (১৮৯৯-১৯০০) আবিষ্কার করে পৃথিবী একটি চুম্বক কেবলই নয়, উত্তম তড়িৎধারক বটে যা স্থায়ী দশা অন্তর একটি নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কে পুনরায় ফিরে ফিরে আসে প্রমাণ করেন। একসময়ে সিগনালিং ব্যবসার উপর গবেষণা চালিয়ে অন্য গ্রহ থেকে সংকেত সংগ্রহ ও শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করে বিবর্ধন সঞ্চালন মিটার আবিষ্কারের পদ্ধতি নামী জার্নালে প্রকাশিত হলে বিজ্ঞানী মহলে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। ১৯০০ সালে নিউইয়র্কে ফিরে এক বেতার সম্প্রচার কেন্দ্র নির্মাণ করেন যা বিশ্বের অন্যতম নজির হয়ে ওঠে। এরপর আবহাওয়া তথ্যসম্পর্কিত বার্তা, কোন ছবি আদানপ্রদান ও স্টক এক্সচেঞ্জের রিপোর্ট প্রভৃতি রেড়িও সিগনালিং ব্যবসায় আনতে গিয়ে সমূহ বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, ফলে সেই যাত্রায় ইতি টেনে টারবাইন নির্মাণে মনোযোগ দেন। ১৯১৫তে বিজ্ঞানী এডিসন নোবেল পেলেন কিন্তু তিনি নোবেল থেকে শতেক যোজন পিছিয়ে পড়েন। যাইহোক, অবশেষে ১৯১৭-য় আমেরিকান ইন্সটিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারস থেকে 'এডিশন মেডেল' লাভ করেন। পরে আরও একাধিক পুরস্কার পেয়ে তিনি সম্মানিত হয়েছিলেন। বিশেষত মহাকাশের সঙ্গে সংযোগ ভাবনায় তাঁকে আবিশ্ব অভিনন্দিত করেছিল। এরই হাত ধরে, এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং, ন্যানো এবং নিউক্লিয়ার প্রযুক্তির পরবর্তীকালে প্রসার ঘটে।

তাঁর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দীর্ঘ গবেষণায় আগেই বলেছি ৭০০টির মতো পেটেন্ট পাওয়া; আবিষ্কারের মৌলিকত্ব প্রমাণ করলেও নোবেল পুরস্কার একাধিকবার না পাওয়ার ঘটনায় আত্মনির্ভরতা আত্মশ্লাঘায় পরিণত হয়ে হতাশা ক্রমে গ্রাস করে ফেলে। যেন সত্যিই একপ্রকার সবকিছু হারানোর লজ্জায় দ্রুত গৃহবন্দী হয়ে পড়েন। মুষ্টিমেয় কয়েকজন, যাঁদের মধ্যে রবার্ট আন্ডারউড জনসন, মার্ক টয়েন্ট, ফ্রান্সসিস ম্যারিয়ন ক্রোফোর্ড প্রমুখ গুটিকয়েক লেখকবন্ধু ছাড়া আর কারও সঙ্গে আর যোগাযোগ ছিল না। ১৯৪৩ সালে ৭ জানুয়ারি সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায় নিউইয়র্কের একটি হোটেল কক্ষে এই মহান মানুষটি মারা যান।

টেসলার মৃত্যুর অনতিবিলম্বে তাঁর যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ ট্রাঙ্কে ভর্তি করে রাখা হয়েছিল। তাঁর গবেষণাপত্রাদি, ডিপ্লোমা সমূহ, সম্মান শংসাপত্রাদি, চিঠিপত্র এবং ল্যাব নোটগুলি ঘটনাক্রমে তাঁর ভাইপো, সেবা কোসানোভিচ এর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে ঐগুলি বেলগ্রেডে 'টেসলা সংগ্রহশালায়' সংরক্ষিত করা হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিন শতশত বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান মনস্ক মানুষ সেন্ট জন ক্যাথিড্রাল চার্চ প্রাঙ্গনে সমবেত হয়েছিলেন এই বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদকে শেষ দেখা এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় হাজির থেকে সাক্ষী থাকার জন্য। সেদিনটির এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে তিনজন নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী এমন প্রতিভাধর, বিশ্বখ্যাত ব্যক্তিত্বকে স্মরণ করেছিলেন; এই বলে তাঁর প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও উদ্ভাবন যা আধুনিককালেও স্মরণীয় থাকবে।

লেখক অবসরপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, বিজ্ঞান গবেষক ও প্রাবন্ধিক।

email:a.ghosh1@yahoo.co.in • M. 8961228439

প্র বী র ব সু

কিউবার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

১৯৫৯ সাল পর্যন্ত কিউবার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ছিল ব্যক্তিপুঁজি নির্ভর এবং স্বাস্থ্য এখানে ছিল পণ্য। সুতরাং স্বাস্থ্য পরিষেবা ছিল গরিব মানুষের নাগালের বাইরে। তাই কিউবার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো নতুন সরকারের সামনে ছিল এক বড় চ্যালেঞ্জ। কিউবার স্বাস্থ্য পরিষেবার দিকনির্দেশ ছিল চেগুয়াভারার একটি ভাষণে, যা তিনি দিয়েছিলেন গণমিলিশিয়ার সামনে। চে নিজে ছিলেন একজন ডাক্তার। তাই তিনি বুঝেছিলেন রোগ সারানোর থেকেও রোগ প্রতিরোধ দেশের মানুষের স্বাস্থ্যের সামগ্রিক অবস্থা ভাল করবার পক্ষে অত্যন্ত জরুরি। কাজেই প্রতিরোধ রোগমুক্তির চেয়ে ভাল এই নীতির উপরেই গড়ে ওঠে কিউবার স্বাস্থ্যনীতি।

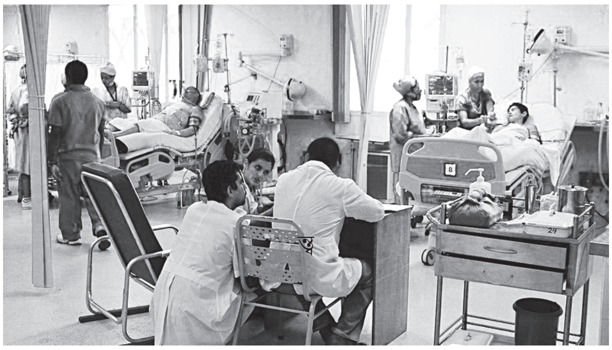

কিউবার রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার কারণে হাসপাতালগুলিতে চাপ কম

কিউবার শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ সরকারি কাজের সঙ্গে যুক্ত। যে দেশের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল একজন প্রযুক্তিবিদ, একজন ডাক্তার, একজন দর্জি বা একজন ড্রাইভার চাকরি জীবনের শুরুতে সবাই সমান মাইনে পান। কিউবার জাতীয় বাজেটের ১০ শতাংশ ব্যয় হয় স্বাস্থ্য খাতে। যেখানে ভারতে ১.৫ শতাংশ। কিউবায় চিকিৎসা শিক্ষা সম্পূর্ণ অবৈতনিক। টিকা বা প্রতিষেধকের ব্যবহারের নিরিখে কিউবা পৃথিবীতে সর্বোচ্চ। কিউবানদের গড় আয়ু ৭৮ বছর এবং গড় কর্মক্ষমতা ৭০ বছর। কিউবায় হৃদরোগের মৃত্যুর সংখ্যা ৪৫ ভাগ কমিয়ে এনেছে। কিউবার শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে মাত্র ৫ জন। কিউবা ১৯৬২ সালে পোলিওকে নির্মূল করেছে ১৯৬৭-তে ম্যালেরিয়া, ৭২-এ নবজাতকের ধনুষ্টংকার, ১৯৭৯-তে ডিপথেরিয়া, ১৯৮৯-এ মামস, পরবর্তী ১৯৯৩-তে হাম, ১৯৯৫-এ রুবেলা এবং ১৯৯৭-এ টিউবারক্যুলাস ম্যানেনজাইটিসকে নির্মূল করেছে। কিউবা একমাত্র দেশ যেখানে ম্যানেনজাইটিস-এর টিকা তৈরি হল। কিউবাতে প্রতি ১৪৮ জনে ১ জন চিকিৎসক।

ঘরের পাশেই ডাক্তার এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত কিউবার স্বাস্থ্য পরিষেবায় প্রত্যেক জনপদেই আছে একটি করে কনসালটেরি বা চিকিৎসালয়। চিকিৎসকেরা চিকিৎসালয়ের কাছাকাছিই থাকেন। পাশাপাশি কোনও প্রাইভেট ব্যবস্থা না থাকায় সকলেই ওই নিকটস্থ চিকিৎসালয়ের উপর নির্ভরশীল। চিকিৎসক ও সেবিকারা অঞ্চলের অধিবাসী হওয়ায় রোগীদের জীবনযাত্রা ও সমস্যা সম্বন্ধে অনেক বেশি ওয়াকিবহাল। চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিতে সহায়তা করার জন্য থাকে পলিক্লিনিক। এগুলি ওয়ার্কিং আওয়ারের পরেও রোগীদের পরিষেবা প্রদান করে। প্রতিটি প্রাথমিক স্তরের চিকিৎসালয়ের সঙ্গে রয়েছে এক্সরে, সিটি স্ক্যান, প্যাথলজির বিভিন্নরকম আধুনিক ব্যবস্থা।

কিউবাতে মাঝে মাঝেই আছড়ে পড়ে হ্যারিকেন ঝড়। আর এই অভিজ্ঞতা থেকেই কিউবানরা গড়ে তুলেছে একটি শক্তিশালী বিপর্যয় মোকাবিলা দল। বিপর্যয়ের সময় খোলা আকাশের নিচেই হাতের কাছে পাওয়া সামান্য সরঞ্জাম দিয়ে চিকিৎসায় পারদর্শী এই দল। কিউবার স্কুলের পাঠক্রমেই রয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলার পাঠ। মানুষের মধ্যে বিপদগ্রস্তদের প্রতি সেবার মানসিকতা এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ব বোধের শিক্ষা তারা রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম থেকে পান, তাই তাদের এই কষ্টকর পথই এনেছে সাফল্যের চাবিকাঠি। তার উপর অর্ধশতাব্দীর মার্কিন অর্থনৈতিক অবরোধ সত্ত্বেও সমাজতান্ত্রিক নীতির জোরে একটি দেশ যে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শিখরে উঠতে পারে তার উজ্জ্বল উদাহরণ কিউবা।

কিউবা একটি দরিদ্র দেশ হওয়া সত্ত্বেও সারা বিশ্বে বাড়িয়ে দিয়েছে তাদের সহমর্মিতার হাত। প্রায় ১৫৪টি দেশে ১,২৪,০০০ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী সারা পৃথিবীতে মানবিকতার স্বার্থে কাজ করে চলেছেন।

কিউবান স্বেচ্ছাসেবীরা সারা পৃথিবী ব্যাপী সেবাকার্যে অংশগ্রহণ করছেন। হন্ডুরাসে শিশু মৃত্যু প্রতিরোধে, পাকিস্তানে ভয়াবহ ভূমিকম্পে, জাম্বিয়ার ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে, পশ্চিম আফ্রিকায় ইবোলা ভাইরাস আক্রমণ প্রতিরোধে—সর্বত্রই তারা অগ্রগণ্য। সারা পৃথিবীতে দুর্গত অঞ্চলে তারা যান সবচেয়ে আগে আর ফেরেন সবার পরে।

বিশ্বের সবচেয়ে অগ্রণী চিকিৎসা বিদ্যালয় ইলামে, ১২টি দেশের ২০,০০০ জনকে চিকিৎসাশাস্ত্রের স্নাতক তৈরি করছেন। রাষ্ট্রপুঞ্জ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বিশ্বের সবচেয়ে অগ্রণী চিকিৎসা বিদ্যালয় বলে বর্ণনা করেছেন।

কিউবার সাক্ষরতার হার শতকরা ৯৯ ভাগ, আর স্কুলে স্বাস্থ্য শিক্ষা আবশ্যিক। গত চার দশকে রোগ প্রতিরোধ ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তার ফলেই দেশের স্বাস্থ্য সূচকগুলির ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। কিউবা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপরাষ্ট্রের একটি ছোট্ট দ্বীপ যা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের থেকে সামান্য বড়। সেই ছোট্ট অনুন্নত অর্থনীতির দেশ কিউবার অগ্রণী স্বাস্থ্য পরিষেবার নেপথ্যে রয়েছে সাতটি নীতি—

সমতা, বিনামূল্যে চিকিৎসা, সহমর্মিতা, সহজলভ্যতা, আন্তর্জাতিকতা, দায়বদ্ধতা এবং ন্যায্য পরিষেবা।

লেখক জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশকর্মী, ভ্রমণ বিষয়ক পত্রিকার সম্পাদক।

email:prabirchandrabasu54@gmail.com • M. 9830676330

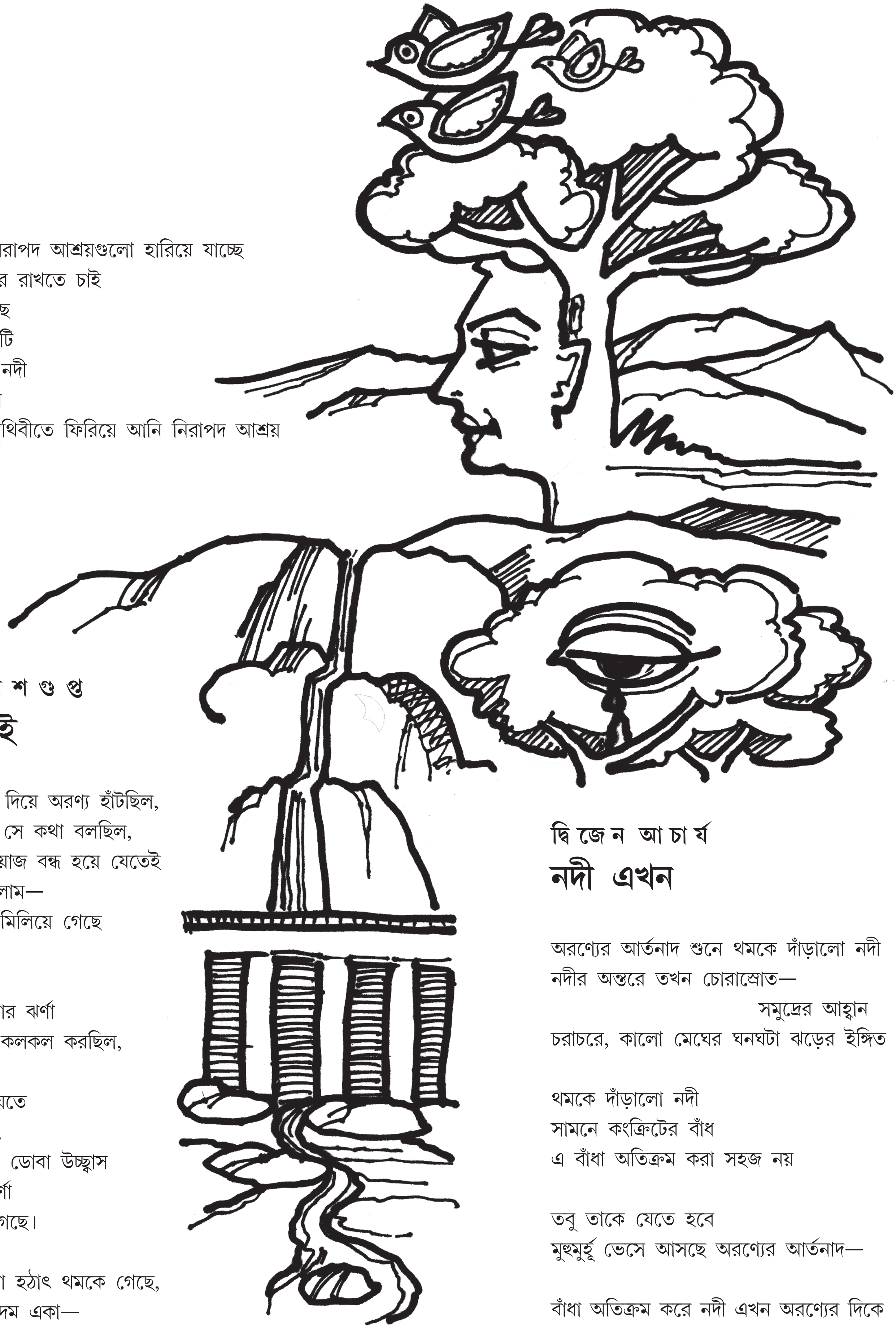

সুব্রত রুদ্র

আশ্রয়

পৃথিবী থেকে নিরাপদ আশ্রয়গুলো হারিয়ে যাচ্ছে
আমি জড়ো করে রাখতে চাই
পাখির কাছে গাছ
গাছের কাছে মাটি
পাহাড়ের কাছে নদী
নদীর কাছে তীর
তীরে দাঁড়িয়ে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনি নিরাপদ আশ্রয়

নির্মাল্য দাশগুপ্ত

ওরা সবাই

আমার ডানপাশ দিয়ে অরণ্য হাঁটছিল,
হাঁটতে হাঁটতেই সে কথা বলছিল,
হঠাৎ তার আওয়াজ বন্ধ হয়ে যেতেই
আমি পাশ ফিরলাম—
দেখলাম অরণ্য মিলিয়ে গেছে
দূরে, বহুদূরে—

পিছনে সরিৎ আর ঝর্ণা
নিজেদের মধ্যে কলকল করছিল,
খুনসুটি করছিল,
বকবক থেমে যেতে
পিছনে ফিরলাম,
দেখলাম হাঁটু না ডোবা উচ্ছ্বাস
আর ক্ষীণাঙ্গী ঝর্ণা
কোথায় মিশে গেছে।

আমার চারপাশটা হঠাৎ থমকে গেছে,
একা আমি, একদম একা—

দ্বিজেন আচার্য

নদী এখন

অরণ্যের আর্তনাদ শুনে থমকে দাঁড়ালো নদী
নদীর অন্তরে তখন চোরাস্রোত—
সমুদ্রের আহ্বান
চরাচরে, কালো মেঘের ঘনঘটা ঝড়ের ইঙ্গিত

থমকে দাঁড়ালো নদী
সামনে কংক্রিটের বাঁধ
এ বাঁধা অতিক্রম করা সহজ নয়

তবু তাকে যেতে হবে
মুহুর্মুহু ভেসে আসছে অরণ্যের আর্তনাদ—

বাঁধা অতিক্রম করে নদী এখন অরণ্যের দিকে

জ গ ন্ম য় ম জু ম দা র

পিঁপড়ে ও গোপালবাবু

(বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যকে নিবেদিত)

তীর্থযাত্রীর মতো পিঁপড়ের সার এগিয়ে চলেছে।
হঠাৎ আক্রমণে ছত্রখান। ডিম ছিনতাই করে পালাচ্ছে
আরেকটি পিঁপড়ে।
আমি ধরতে যেতে দ্রুত কামড়ে দেয়। পিঁপড়ে কি চায় না
তার ডিম ফেরৎ আসুক?

সহসা উদয় হলেন আমাদের ভট্চায্ মশাই। তার
পায়ে কাদা, গা থেকে বেরোচ্ছে গাছগাছালির গন্ধ—কাঁধে এক
ঝোলা—ঝোলার ভিতর থেকে উঁকি মারছে—পিঁপড়ে নয়,
পিঁপড়ের মুখোশ পরা একটি মাকড়সা।

কে কামড়ালো?
পিঁপড়ে না ডিমচোর মাকড়সা—আমার
ধন্দ কাটে না।
ততক্ষণে গোপালবাবু কোথায় উধাও। আমার ঘোর কেটে গেলে দেখি
ভুল করে তিনি ফেলে গেছেন জংলি ঝোলাটুকু তার।

চ ন্দ্র শে খ র ঘো ষ

রঙ বদল

ক্ষার ও অ্যাসিডের প্রভাবে
লিটমাস রঙ বদল করে
আমার বুকের জমি অনুর্বর রুক্ষ
কোন রসায়নে বদলে দিলে তুমি?
আমার আকাশে এখন পাখিদের গান ভাসে...

অ ম র ঘো ষ

অপেক্ষা

ক্ষেপণাস্ত্র কাঁটাতারের সীমানা মানে না
আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করে তোলো
ভালবাসতে
অথচ, কথা রাখলে না
আকাশ রাঙিয়ে ডুবে গেল সূর্য
নতুন দিশা কোথায়?
আগামী সূর্য কোন দেশে দেখা দেবে—

নতুন গবেষণার অলিন্দে

অ মি তা ভ চ ক্র ব র্তী

মিউটেশনের নেপথ্যে কী কোয়ান্টাম বলবিদ্যা?

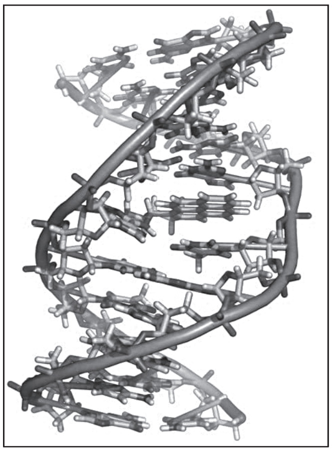

ডি এন এ-র রাসায়নিক গঠন

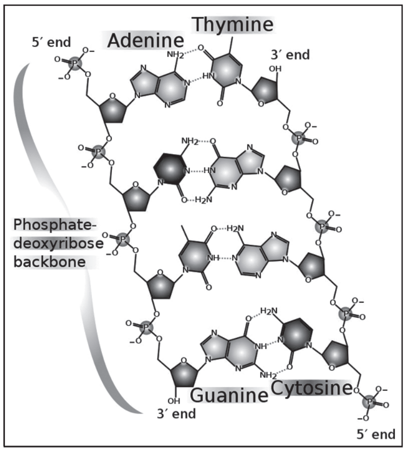

হাইড্রোজেন বন্ড বিন্দুযুক্ত রেখাগুলি সহ ডি এন এ

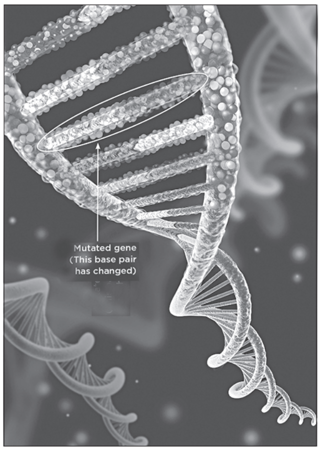

যখন জেনেটিক মিউটেশান ঘটে

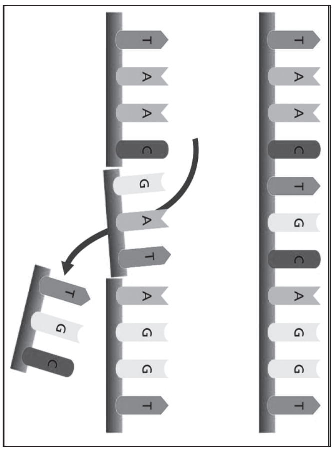

ডি এন এ মিউটেশান

প্রোটিন জীবদেহের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। হরমোন, হিমোগ্লোবিন, ভিটামিন থেকে শুরু করে আমাদের দেহের বিভিন্ন টিস্যু ও অঙ্গগুলির গঠনে প্রধান ভূমিকা রাখে প্রোটিন। প্রোটিন তৈরিতে সক্রিয় ভূমিকা হল রাইবোজোম নামক একটি কোষিয় অঙ্গাণুর। আমাদের দেহে নির্দিষ্টি প্রোটিন তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যযুক্ত অণুগুলিকে বিজ্ঞানীরা একটি ক্রমে চিহ্নিত করে থাকেন। DNA-তে সেই চিহ্নকে ATGC এই অক্ষরগুলির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। এই কোডটি অত্যন্ত স্থিতিশীল এবং দেহের টিস্যু এবং অঙ্গগুলির গঠনে কার্যকরী ভূমিকা রাখে। তবে পরিবর্তন বা মিউটেশন ক্রমাগত ঘটতে থাকে। এই পরিবর্তনের ফলে কোডের প্রতিলিপি পড়ার সময় কখনো হয়ত ভুল হয়ে যায়, যা শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত প্রোটিনটিকে প্রভাবিত করে ফেলে। অথচ কোষটি মূল তথ্য থেকে তৈরি করার কথা ছিল। মিউটেশনের ফলে উৎপন্ন প্রোটিন জীবদেহে যে ভূমিকা পালন করে তার উপর নির্ভর করে দেহে খুব মারাত্মক কোনো প্রভাব পড়তে পারে।

মিউটাজেনিক এজেন্ট (মিউটেশনের জন্য দায়ী), যেমন- প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম উৎস (যেমন সূর্য বা এক্স-রে ডিভাইস) অথবা কোনো রাসায়নিক পদার্থ থেকে উৎপন্ন বিকিরণ, ইত্যাদির মাধ্যমে এই ধরনের মিউটেশনগুলি ঘটতে পারে। আবার অনেক ক্ষেত্রেই মিউটেশনের জন্য কোনো মিউটাজেনিক এজেন্ট আছে বলে মনে হয় না— এরা 'স্বতঃস্ফূর্ত'। এখন প্রশ্ন হল, এই স্বতঃস্ফূর্ত মিউটেশন কীভাবে ঘটে? ইংল্যান্ডে সারে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষকদলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'সুড়ঙ্গ প্রভাব' বা 'টানেলিং এফেক্ট' নামে একটি কোয়ান্টাম বলবিদ্যার প্রভাব এই ধরনের মিউটেশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ওঁদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এখানে টানেলিং ঘটে যখন একটি সাব-অ্যাটমিক কণা (এই ক্ষেত্রে একটি প্রোটন) শক্তি বাধা (energy barrier)-এর মধ্য দিয়ে যায়; একটি শক্তি বাধায় প্রবেশ করে অন্য দিকে নির্গত হয়। অর্থাৎ এমন এক পরিস্থিতি, যা সনাতন বলবিদ্যার নিরিখে বা ক্লাসিক্যালভাবে অসম্ভব। ঘটনাটি অনেকটা একটি টেনিস বলের কোনো কংক্রিটের প্রাচীর অতিক্রম করার মতো, যেখানে বলটি না লাফিয়ে প্রাচীর অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে। অত্যন্ত সূক্ষ্ম সাবঅ্যাটমিক স্কেলে এমন কাণ্ড ঘটতেই পারে। কারণ সাবঅ্যাটমিক কণাগুলির তরঙ্গ ধর্ম প্রকট এবং তরঙ্গগুলি একটি বাধা থেকে যেমন প্রতিফলিত হতে পারে তেমনি আংশিকভাবে একটি বাধাকে অতিক্রম করে অন্য দিকে যেতেও পারে।

একটি DNA দ্বি-তন্ত্র (ডবল-স্ট্র্যান্ড) হাইড্রোজেন বন্ধনীর উপর নির্মিত হয় (বিন্দুযুক্ত লাইন দিয়ে চিত্রে দেখানো হয়েছে), যা জৈব অণুতে একটি সাধারণ সমযোজী রাসায়নিক বন্ধনের চেয়ে অনেক কম শক্তিশালী। হাইড্রোজেন বন্ধন নির্দিষ্ট 'অক্ষরগুলি' (আদতে DNA-তে উপস্থিত নাইট্রোজেন ঘটিত ক্ষার)-র মধ্যে গঠিত হয়। আমরা সবাই জানি G (গুয়ানিন) সর্বদা C (সাইটোসিন)-এর সঙ্গে এবং A (অ্যাডেনিন) আবদ্ধ থাকে T (থাইমিন)-এর সঙ্গে। যতক্ষণ এরা এইভাবে জুড়ে থাকে ততক্ষণ কোডটি প্রতিলিপিকরণ এবং নির্ভুলভাবে নির্দেশ প্রেরণ করার সুযোগ থাকে। তবে কখনও কখনও হাইড্রোজেন বন্ধনগুলির মধ্যে একটিতে হাইড্রোজেন থেকে প্রোটনটি খুলে সুড়ঙ্গ প্রভাবের মাধ্যমে এক অণু থেকে অন্য অণুতে চলে যায়; অর্থাৎ, G থেকে C পর্যন্ত একটি হাইড্রোজেন এবং C থেকে G পর্যন্ত একটি হাইড্রোজেন। এই ক্ষেত্রে, G পরিণত হয় G*-এ এবং C রূপান্তরিত হয় C*-এ। G* এবং C* হল মূল G এবং C এর 'টটোমার' সংস্করণ (নিম্নলিখিত চিত্রে দেখানো হয়েছে)। যখন প্রতিলিপিকরনের জন্য DNA দ্বিতন্ত্র খুলে যায়, আর তখন যদি কোনও জোড়া G-C, G*-C* এ পরিবর্তিত হয়, তবে অন্যান্য অণুগুলির এদেরকে চিনতে ভুল হতে পারে। অনেকক্ষেত্রেই T মনে করে G* একটি A এবং A মনে করে

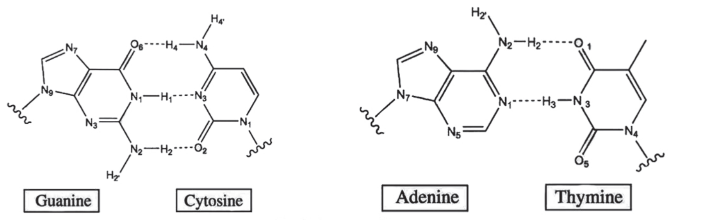

চারটি নাইট্রোজেনঘটিত ক্ষার

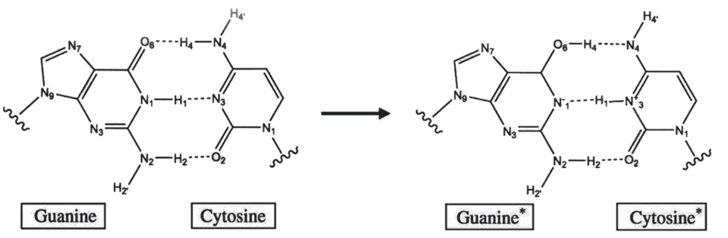

গুয়ানিন ও সাইটোসিনের ক্যানোনিকাল গঠন এবং তাদের টটোমার

C* একটি T-কে গ্রহণ করে। এইভাবে সেখানে G*-T এবং C*-A নতুন জোড়া গঠিত হয়। ফলে জেনেটিক কোডে ত্রুটি তৈরি হয়। এই ঘটনা একটি মিউটেশন।

কোয়ান্টাম মেকানিক্স আণবিক বায়োফিজিক্সে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, এটা নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। পরমাণুর মধ্যে জড়িত রাসায়নিক বন্ধন সম্পর্কিত অধিকাংশ প্রক্রিয়াগুলিই কোয়ান্টাম বলবিদ্যার নিয়ম মেনে চলে। তবে বিভিন্ন জৈবিক প্রক্রিয়াগুলিতে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার অবদান উদ্ঘাটন করা প্রায়শই খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তাই মিউটেশনের উৎস হিসাবে জেনেটিক কোডের মধ্যে টটোমারগুলির ভূমিকা নিয়েও বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। এর কারণ হল DNA-তে 'tautomerization' প্রক্রিয়া, যেখানে একটি ডবল হাইড্রোজেন স্থানান্তরের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়াটি এখনও অস্পষ্ট।

কমিউনিকেশনস ফিজিক্স জার্নালে সদ্য প্রকাশিত এক গবেষণা প্রবন্ধে জিম আল-খলিলির নেতৃত্বাধীন গবেষক দলটি যুক্তি দিয়েছেন, ডাবল টানেলিং প্রক্রিয়াটি এত দ্রুত সঞ্চালিত হয় যে ডাবল হাইড্রোজেন স্থানান্তরের প্রক্রিয়াটি কোষের কার্যকলাপের সময়স্কেলে প্রাসঙ্গিক নয়। তাছাড়াও ওঁরা দেখতে পেয়েছেন হাইড্রোজেন বন্ধনের প্রোটনগুলি DNA-র অণুগুলির মধ্যে এত উচ্চ হারে বিনিময় হচ্ছে যে ডবল-স্ট্র্যান্ড বিচ্ছেদের উপর টাটোমারগুলি থেকে আসা প্রতিলিপি কোডের ত্রুটিগুলি হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়।

মিউটেশন শুধুমাত্র রোগের জন্য নয়, বৈচিত্র্য এবং বিবর্তনের জন্যও দায়ি। ফলে মিউটেশনের পদার্থবিজ্ঞান সম্পর্কিত জানা-বোঝা আমাদের উৎপত্তি বুঝতেও সাহায্য করতে পারে।

লেখক বিজ্ঞানের শিক্ষক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক।

email:acnbu13@gmail.com • M. 8967965340

দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান

অ নি ন্দ্য দে

পুরনো বই রঙে বাড়ে

অনেক দিনের পুরনো বই-এর পাতা হলদে হয়ে যায়, আর খুব ভঙ্গুরও হয়ে যায়। ব্যাপারটা আমাদের সবারই জানা। কিন্তু কেন এমন হয় সেটা বলতে পারবেন কি? ঠিক আছে। একবার খোঁজ করে দেখা যাক।

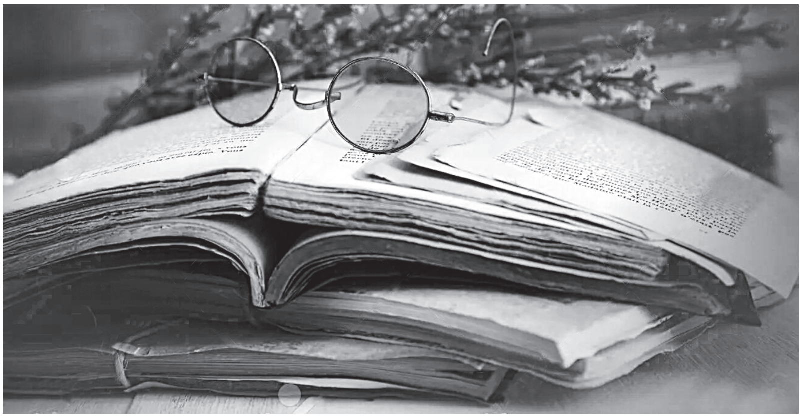

আসলে বই তৈরির অনেক আগে, কাগজ তৈরির সময়ে অ্যালুমিনিয়াম সালফেট নামের অজৈব পদার্থকে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এই অ্যালুমিনিয়াম সালফেট ভেঙে গিয়ে তৈরি করে অ্যালুমিনিয়াম আয়ন। এই অ্যালুমিনিয়াম আয়ন বায়ুর জলীয়বাষ্পের সাথে বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন আয়ন তৈরি করে। কাগজ মূলত সেলুলোজ দিয়ে তৈরি একটি জৈব পদার্থ। ঐ হাইড্রোজেন আয়ন কাগজের সেলুলোজকে ভেঙে দেয়। আর তাতেই বইয়ের পাতা অনেকদিন পরে খুব ভঙ্গুর হয়ে যায়।

ঐ সেলুলোজের সাথেই কাগজে আরেকটা জৈব পদার্থ থাকে, যার নাম লিগনিন। আলো আর পারিপার্শ্বিক বায়ুর সংস্পর্শে এই লিগনিনের আণবিক গঠন পাল্টাতে শুরু করে। অণুর মধ্যে ক্রোমোফোরস্ নামের একটা অংশ তৈরি হয়। এই ক্রোমোফরস্ নির্দিষ্ট কিছু তরঙ্গদৈর্ঘের আলোকে প্রতিফলিত করতে পারে। লিগনিনের মধ্যে তৈরি ক্রোমোফোরস্ হলুদ বা বাদামী বর্ণের আলো প্রতিফলিত করে। আর তাতেই বই পুরনো হয়ে গেলে হলদে দেখায়।

লেখক বিজ্ঞানের শিক্ষক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক।

email:anindya05@gmail.com. • M. 9432220412

ভবানীপ্রসাদ সাহু

ছেলের জন্য শিশুবলি

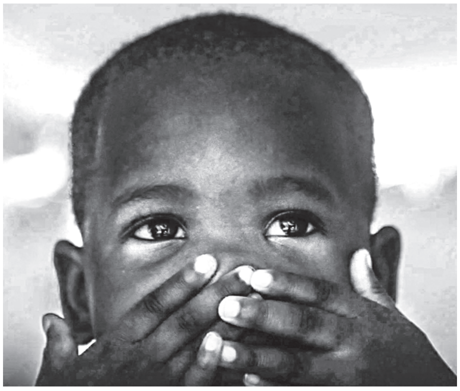

এখনো আমাদের দেশে কল্পিত অলৌকিক শক্তি তথা দেবদেবীকে সন্তুষ্ট করে নিজের কোন উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য নরবলি বা শিশুবলি দেওয়া হয়, এমন কথা শুনে পৃথিবীর সভ্যদেশের মানুষেরা আঁতকে উঠবেন। আমাদের দেশেও অনেকে হয়ত অবিশ্বাসের চোখে তাকাবেন। কিন্তু বাস্তব সত্য। সংবাদপত্রের পাতা খুললে বছরে দু-চারটে এমন ঘটনার উল্লেখ ছোট্ট আকারে প্রকাশিত হতে দেখা যাবে।

এই তো কিছুদিন আগে, বিহারের একটি গ্রামে প্রতিবেশীর চার বছরের শিশুকে বলি দিয়েছিল শৈলদেবী (৬০) ও তার স্বামী কৈলাশ সাহনি। (দি টাইমস অব ইন্ডিয়া; ০৩.১২.১৬) উদ্দেশ্য ছিল একটি নাতি পাওয়া। এদের ছেলে ধর্মেন্দ্র সাহনি (৪২)-র প্রথম পক্ষের স্ত্রী-র তিনটে মেয়ে জন্মেছিল। ছেলের আশায় আবার বিয়ে করলে তারও হয় দুটি মেয়ে। ধর্মেন্দ্রর মা শৈলদেবী যাদুবিদ্যা নাকি জানত। এই 'বিদ্যা' প্রয়োগ করে, সে ঠিক করল অন্য একটি বাচ্চা ছেলেকে যদি বলি দেওয়া হয়, তবে ধর্মেন্দ্রর ছেলে হবে, হবেই হবে। আর তার জন্য প্রতিবেশীর ঐ চার বছর বয়সী শিশুপুত্রকে সাথে নিয়ে গিয়ে বলি দিল। ঘটনাটি ঘটেছিল ২২ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে। শেষ রক্ষা আর হয়নি। শৈলদেবী-কৈলাশ সাহনি গ্রেপ্তার হয়েছে। সংবাদ প্রকাশের সময় ধর্মেন্দ্র ছিল পলাতক। অন্ধ কুসংস্কারের কি ভয়াবহ পরিণতি।

অথচ এখন বিদ্যালয়ের জীবনবিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীরাও জানে পুত্র বা কন্যা জন্মানোর জন্য বিশেষ ক্রোমোজোম দায়ি। কোন অলৌকিক শক্তি বলে কিছু যেমন নেই, তাই তাকে সন্তুষ্ট করে কোন মহিলা পুত্রের জন্ম দেবে এটি যেমন অসম্ভব, তেমনি বারবার মেয়ের জন্মের জন্য মায়েরও কোন ভূমিকা নেই।

আমাদের শরীরের কোষে যে ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম থাকে, তার মধ্যে একজোড়া হচ্ছে সেক্স-ক্রোমোজোম অর্থাৎ যেটি লিঙ্গনির্ধারণ করে। পুত্রসন্তান তথা পুরুষের থাকে এক্স ও ওয়াই নামের দুটি ক্রোমোজোম। কন্যাসন্তান তথা নারীর দুটিই এক্স। সন্তান জন্মের আগে, যৌনমিলনে পুরুষের শরীর থেকে নারীর জরায়ুতে যায়, হয় এক্স বা ওয়াই যুক্ত পুংজনন কোষ বা শুক্রাণু কিন্তু নারীর শরীরে ডিম্বাশয় বা ওভারি থেকে বেরোনো স্ত্রী-জননকোষে বা ডিম্বানুতে থাকে শুধুমাত্র এক্স সেক্স-ক্রোমোজোম। জরায়ুতে উভয়ে মিলিত হয়। পুরুষের থেকে আসা লক্ষ লক্ষ পুংজননকোষের মধ্যে সাধারণভাবে মাত্র একটির সঙ্গে, নারীর পুরো ২৮ দিনের ঋতুচক্রে ওভারি থেকে বেরোনো মাত্র একটি স্ত্রীজননকোষ মিলিত হয়। ঘটনাচক্রে যদি শুক্রাণুতে এক্স সেক্স-ক্রোমোজোম থাকে তবে শিশুর ভ্রূণের সেক্স-ক্রোমোজোমের দুটিই হবে এক্স অর্থাৎ সেটি হবে মেয়ে। অন্যদিকে ওয়াই সেক্স-ক্রোমোজোম যুক্ত শুক্রাণুর সঙ্গে মিলনে ভ্রূণের দুটি সেক্স-ক্রোমোজোমের একটি হবে এক্স, অন্যটি ওয়াই অর্থাৎ ছেলে। লক্ষ লক্ষ শুক্রাণুর কোনটি ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হবে, তা কেউ ইচ্ছা করে প্রভাবিত করতে পারে না, কোন পুজা-আচ্চা শান্তিস্বস্ত্যয়ন বা নরবলি-শিশুবলি দিয়ে তো নয়ই। যদিও পুত্রের জন্মের জন্য অন্য নানাবিধ টোটকা বা পদ্ধতির কথা অনেকে বলে, এগুলির কোনটিই আদৌ নির্ভরযোগ্য বা সুনিশ্চিত নয়।

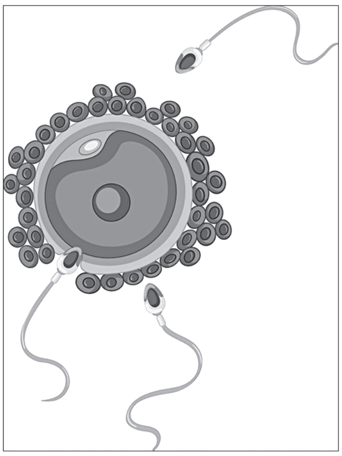

শুক্রাণু ও ডিম্বানুর মিলন

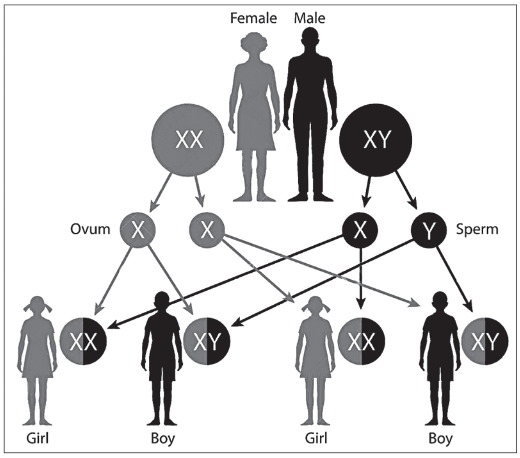

লিঙ্গ নির্ধারণ পক্রিয়া

তাই বারবার মেয়ে হওয়ার জন্য এখনো অনেকে যে মা-কেই দায়ি করে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। যদি আদৌ কোন ভূমিকা থাকে, তবে তা বরং বাবার কারণ তার থেকেই আসবে ওয়াই সেক্স-ক্রোমোজোম। অবশ্য এক্ষেত্রে বাবারও কোন 'দোষ' নেই। তবু আমরা দেখি অনেক পরিবারে বারবার মেয়ের জন্ম দেওয়ার জন্য বধূটির উপর নানারকম অত্যাচার চালানো হয়, গঞ্জনা দেওয়া হয়, বিবাহবিচ্ছেদ থেকে বধূর আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটে। যেহেতু সরাসরি মায়ের শরীর থেকে সন্তান জন্মাচ্ছে, তাই পুত্র বা কন্যাসন্তানের জন্য সেই-ই দায়ি, এমন একটি কুসংস্কার আর তার মর্মান্তিক পরিণাম এখনো আমাদের দেশে এই একবিংশ শতাব্দীতে বর্তমান।

এবং আরো ভয়ংকর হল অলৌকিক শক্তিকে সন্তুষ্ট করার জন্য নিরীহ নির্দোষ সুন্দর একটি শিশুকে তার উদ্দেশ্যে বলি দিয়ে, পুত্রসন্তান পাওয়ার প্রচেষ্টা।

লেখক চিকিৎসক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক।

email: sahoo2331953@gmail.com • M. 8777598939

ছাগলের কানের তরুনাস্থি ব্যবহার করে রাইনোপ্লাস্টি ও মাইক্রোশিয়া

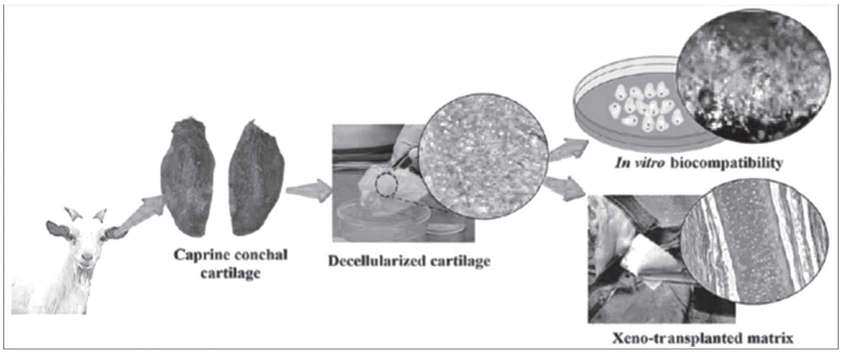

রাইনোপ্লাস্টি

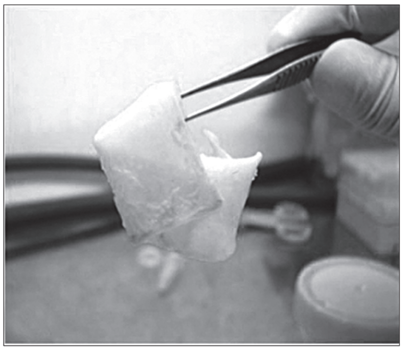

তরুনাস্থি থেকে কোষ সংগ্রহ

আগে

পরে

আগে

পরে

নাক ও কানের সুন্দর গড়ন মুখশ্রীকে এক অন্যমাত্রা প্রদান করে। অন্যদিকে জন্মগত ভাবে বা দুর্ঘটনা জনিত কারণে নাক ও কানের আকৃতি অসুন্দর বা বিকৃত হলে অনেকেই হীনমন্যতায় ভোগেন। এর সমাধানে সাহায্য নেওয়া হয় প্লাস্টিক সার্জারির। বেশীর ভাগ সময়ে ইমপ্ল্যান্টের খরচের কথা ভেবে তা আর হয়ে ওঠে না। এই সমস্যার সমাধানে এগিয়ে এলেন কয়েকজন প্রাণী ও মানুষের চিকিৎসক-গবেষক। ছাগলের কানের তরুনাস্থি ব্যবহার করে যৌথ ভাবে এঁরা তৈরী করেছেন এমন ইমপ্লান্ট যা একাধারে হবে সস্তা ও সুলভ। রাইনোপ্লাস্টি ও মাইক্রোশিয়া অপারেশনে এই ইমপ্ল্যান্ট আজ দারুণ সফল। ভারত সরকারের জৈব প্রযুক্তি বিভাগের আর্থিক সহায়তায় করা এই গবেষনা প্রকল্পে যুক্ত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় ও আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের সাতজন গবেষকের একটি দল।

ইমপ্ল্যান্ট তৈরীতে হঠাৎ ছাগলের কান কেন? এই গবেষণা প্রকল্পে মুখ্য গবেষক অধ্যাপক সমিত কুমার নন্দী এই অভিনব উদ্যোগের কারণ বুঝিয়ে বলেন- আমাদের লক্ষ্যই ছিল এমন জৈব সামগ্রী যা একদিকে হবে সস্তা ও সুলভ, অন্যদিকে শরীরের পক্ষে গ্রহণযোগ্য ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ারহিত। ছাগলের কান যেহেতু মাংস বিক্রির পর ফেলে দেওয়া হয়, তার বাজার মূল্য কম ও এটিকে সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। অথচ এর তরুনাস্থি কলাকে ব্যবহার করে বায়ো ইমপ্ল্যান্ট বানানো সম্ভব। কিন্তু ছাগলের কানের তরুণাস্থি মানুষের শরীর নেবে তো? এর উত্তরে এই প্রকল্পের অন্যতম গবেষক অধ্যাপক সিদ্ধার্থ জোয়ারদার এর বিজ্ঞান ভিত্তিক কারণ ব্যাখা করেন। যেহেতু এই ধরনের ট্রান্সপ্লান্টেশনকে "জেনোজেনিক" বলা হয়, তাই শরীরে তার গ্রহণযোগ্যতা কম হতে পারে। সেজন্য বিশেষ শোধনব্যবস্থা প্রয়াগ করে আমরা এর বিক্রিয়াশীল অংশকে বাদ দিয়ে নিয়েছিলাম। এরপর গবেষণাগারে সেল কালচার পদ্ধতি ব্যবহার করে এদের গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করা হয়। পরে খরগোস-এ কোনো বিক্রিয়া না হওয়ায় মানুষে ব্যবহার করা হয়। গবেষকদলের প্লাস্টিক সার্জন অধ্যাপক রূপনারায়ণ ভট্টাচার্য মানুষের শরীরে সফলভাবে প্রয়াগ করতে পেরে যারপরনাই খুশী। এই প্রকল্পের সাফল্যে স্বভাবতই খুশী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক চঞ্চল গুহ। তাঁর কথায়, এই গবেষণা ভবিষ্যতে এই ধরনের যৌথ উদ্যোগকে আরও উৎসাহিত করবে। এই কাজটির জন্য পেটেন্টের আবেদন করা হয়েছিল এবং তা সম্প্রতি পাওয়া গেছে, জানালেন অধ্যাপক নন্দী। এই গবেষণার দলে যুক্ত ছিলেন ডঃ বিকাশ কান্তি বিশ্বাস, অধ্যাপক সুভাশিস বটব্যাল, অধ্যাপক প্রদীপ কুমার দাস ও শ্রীমতি (ড.) পিয়ালি দাস। গবেষণা, খামার ও সম্প্রসারণ অধিকরণের অধিকর্তা অধ্যাপক তপন কুমার মন্ডল, ভেটেরিনারি অনুষদের অধ্যক্ষ অধ্যাপক নীলোৎপল ঘোষ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধক অধ্যাপক পার্থ দাস এই কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং মানবকল্যাণে এই কাজ ভবিষ্যতে বাস্তবতা পাবে, এই আশা ব্যক্ত করেন।

—নিজস্ব প্রতিবেদক

সৌ ম্য কা ন্তি জা না

অ্যালিগেটর গার ও পরিবেশের বিপদ

গত ২৯ অক্টোবর সকালে জনপ্রিয় বাংলা দৈনিকের একটা খবরে গেল চোখ আটকে—“ডায়মন্ড হারবারে মিলল মৎস্য অবতার, ‘জীবন্ত জীবাশ্ম’ ঘিরে চাঞ্চল্য”। খবরটা পড়ে বছর দশেক আগের একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। আমার সহকর্মী একদিন বলল, ‘আমার পুকুরে একটা অদ্ভুত মাছ পাওয়া গেছে। জালে উঠেছে। লোকজন দেখে বলছে এটা নাকি ক্রোকোডাইল ফিস। অ্যাকোয়ারিয়ামে পোষে। কেউ নিশ্চয়ই আমার পুকুরে কখনও ছেড়ে দিয়েছিল। তুমি চেনো?’ এই বলে তিনি আমাকে মোবাইল ফোনে তোলা মাছটার ছবি দেখালেন। ক্রোকোডাইল ফিসের ছবি আগে কোথাও দেখেছিলাম। হয়ত কোনও পত্রিকায় বা টিভিতে। ঠিক মনে নেই। সবজান্তা গুগলের শরণাপন্ন হলাম। দেখলাম, হ্যাঁ ওটা ক্রোকোডাইল ফিসই। সহকর্মীটি জানতে চাইলেন, ‘এই মাছ কি খাওয়া যায়?’ বললাম, ‘আমাদের দেশে যে খাওয়া হয় না তা নিশ্চিত। তবে আজকাল মানুষে কী না খায়।’ উনি বলছিলেন, ওর পুকুরের প্রায় সব মাছই নাকি সাবাড় করে দিয়েছে ওই ক্রোকোডাইল ফিস। আমি বললাম, ‘মাছটা আমাকে দাও। আমি স্কুলের ল্যাবরেটরিতে সংরক্ষণ করে রাখবে।’ সেই থেকে সাত-আট ইঞ্চি লম্বা ক্রোকোডাইল ফিসটি আমার ল্যাবে জারবন্দী। আর তাই সংবাদপত্রের খবরটি পড়ে আমার আদৌ বিস্ময় জাগেনি, বরং চিন্তার ভাঁজ পড়ল কপালে।

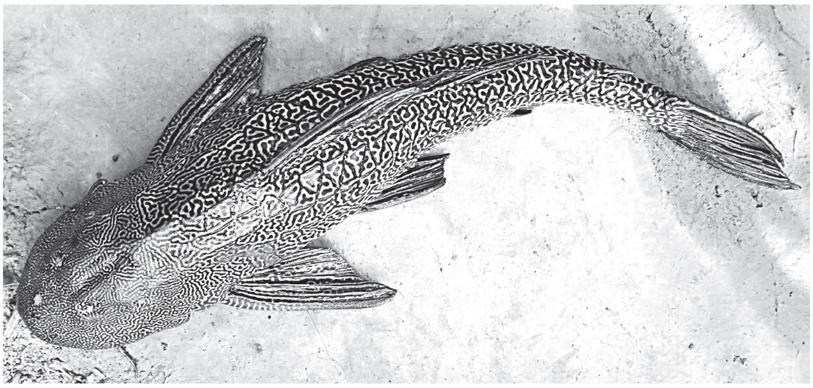

কুমির মাছ (অ্যালিগেটর গার)

চিন্তার কারণটা পরে বলছি। আগে ক্রোকোডাইল ফিসের পরিচয় পর্বটা সেরে ফেলি। ক্রোকোডাইল ফিস হল এর সাধারণ নাম। কুমিরের সাথে এর আদৌ কোনও সম্পর্ক নেই। আসলে এর লম্বাটে চোয়াল আর তাতে তীক্ষ্ণ দাঁতের দুটি সারি এবং দেহ জুড়ে শক্ত ও ধারালো আঁশের উপস্থিতির জন্য সাধারণ লোক এর সাথে কুমিরের মিল খুঁজে পেয়েছে।

ক্রোকোডাইল ফিসের বিজ্ঞানসম্মত নাম অ্যালিগেটর গার (*Alligator gar*)। উত্তর আমেরিকার মেছো কুমির অ্যালিগেটরের সাথে এদের লম্বাটে চোয়ালের সাদৃশ্য থাকায় এমন নাম। এই মাছ আদতে উত্তর আমেরিকার আদি বাসিন্দা। এরা উত্তর আমেরিকায় মিষ্টি জলে বসবাসকারী মাছদের মধ্যে আকারে সবচেয়ে বড় হয়। এরা গড়ে লম্বায় ছ ফুট আর ওজন ৪৫ কেজি। তবে ১০ ফুট পর্যন্ত লম্বা ও ১৫৯ কেজি ওজনের অ্যালিগেটর গার পাওয়া গেছে।

মাছটার নানারকম বিশেষত্ব আছে। এদের পটকা অন্য মাছেদের থেকে ভিন্ন। এদের পটকার সাথে ফুলকার সংযোগ আছে। ফলে পটকা যে এদের শুধু জলের মধ্যে ভাসতে বা ডুবতে সাহায্য করে তাই-ই নয়, শ্বাসকার্যেও সাহায্য করে। আর তার ফলে কম অক্সিজেনযুক্ত যে জলে অন্য মাছের পক্ষে বাঁচা কষ্টকর সেখানে এরা দিব্যি বেঁচে থাকতে পারে। এদের আঁশও অন্য মাছেদের থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। অত্যন্ত ধারালো, করাতের মতো খণ্ডিত কিনারাযুক্ত, রম্বসাকৃতি ও খুব শক্ত এই আঁশ গ্যানয়েড প্রকৃতির। এইরকম আঁশের জন্য অন্য কোনও জলজ প্রাণী এদের খাদ্য হিসেবে শিকার করতে পারে না। এদের পৃষ্ঠ পাখনা আর পায়ু পাখনা দেহের অনেকটা পেছনের দিকে থাকে যা সচরাচর অন্য মাছের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। আর পুচ্ছ পাখনা হাঙরের পুচ্ছ পাখনার মতো অসম-বিভক্ত অর্থাৎ হেটেরোসারকাল।

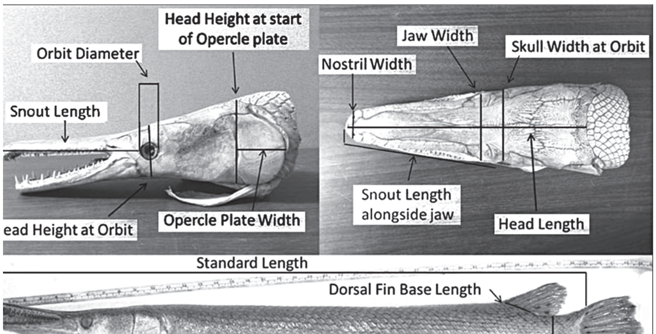

অ্যালিগেটরের দেহ ও খুলির দৈর্ঘ্য

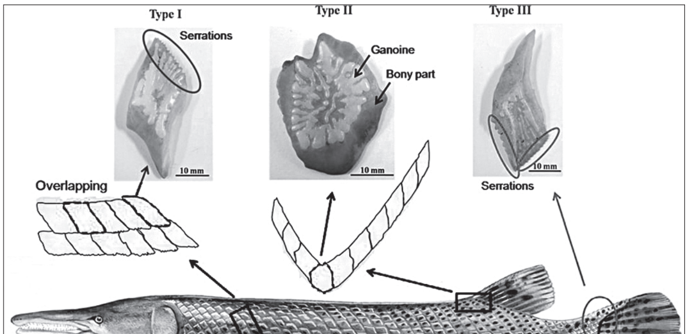

অ্যালিগেটরের প্রতিরোধী আঁশগুলির গঠন

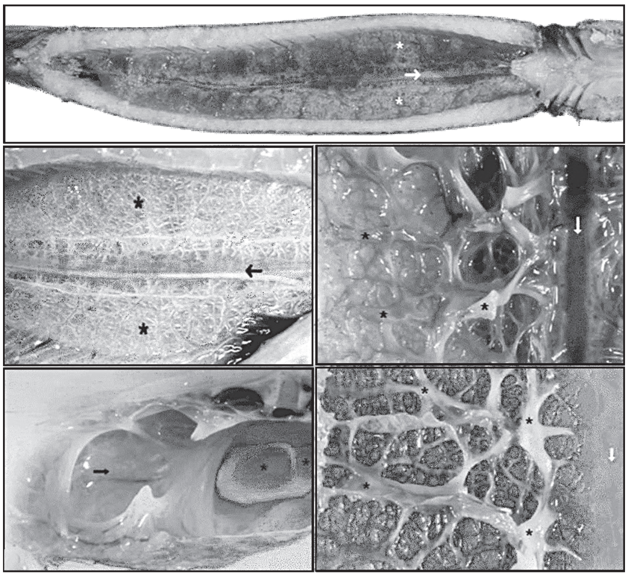

অ্যালিগেটরের পটকা ও তার অন্তর্গঠন

আবার হাঙরের সাথে আরও একটা মিল আছে। হাঙরের মতো এদের অন্ত্রেও সর্পিলাকার কপাটিকা (Spiral Valve) উপস্থিত। এইসব বৈশিষ্ট্য দশ কোটি বছর আগেকার অ্যালিগেটর গারের জীবাশ্মেও দেখা গিয়েছে। অর্থাৎ এরা কমপক্ষে দশ কোটি বছর ধরে প্রায় কোনও পরিবর্তন ছাড়াই বহাল তবিয়তে টিকে রয়েছে। তাই অ্যালিগেটর গারকে 'জীবন্ত জীবাশ্ম' বা 'Living Fossil' বলা যায়। প্রাগৈতিহাসিক অ্যালিগেটর গারের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা ও ভারত থেকে। এ থেকে বোঝা যায় প্রাচীনকালে মাছটির বিস্তার ছিল প্রায় সমগ্র পৃথিবী জুড়ে।

অ্যালিগেটর গার খাদ্য হিসেবে প্রধানতঃ মাছ শিকার করে। এছাড়া কাঁকড়া, কচ্ছপ এমনকি জলজ পাখিও খায়। এরা রাত্রিবেলায় খাবার শিকার করতে অভ্যস্ত। এরা বাঁচে দীর্ঘদিন। স্ত্রী মাছ ডিম পাড়ার উপযুক্ত হয় প্রায় দশ বছর পর। যখন জলের উষ্ণতা ২০-২৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে পৌঁছোয় এবং জলে জৈব পদার্থের পরিমাণ বেড়ে যায় তখন ঘাস ও আগাছাপূর্ণ জলাশয়কে ডিম পাড়ার উপযুক্ত স্থান হিসেবে বেছে নেয়। এক একবারে এরা প্রায় দেড় লক্ষ ডিম পাড়ে। ডিমের রঙ উজ্জ্বল লাল। আর এই ডিম বিষাক্ত। মানুষ যদি ভুল করে খেয়ে নেয় বিষক্রিয়াজনিত কারণে মৃত্যুও হতে পারে। খাদ্য হিসেবে মাছটি মানুষের গ্রহণযোগ্য না হলেও উত্তর আমেরিকা ও ক্যারিবিয় দ্বীপপুঞ্জের আদি অধিবাসীরা এই মাছের আঁশ দিয়ে তীরের ফলা বানানোর কৌশল আয়ত্ত করেছে বহুকাল আগে থেকে। তাছাড়া এই মাছের চামড়া দিয়ে প্রাচীনকালে মানুষ কাঠের লাঙলের আবরণ তৈরি করত।

বর্তমানকালে কেবল অ্যাকোয়ারিয়ামে পালন করা ছাড়া অন্য কোনও কাজে এই মাছ ব্যবহার করা হয় না বললেই চলে। আর এটাই পরিবেশের জন্য হয়ে উঠেছে বিপজ্জনক। মাছের আকার যখন অ্যাকোয়ারিয়ামে পালনের পক্ষে বড় হয়ে যায় তখন অনেকেই এই মাছকে অ্যাকোয়ারিয়াম থেকে বের করে স্থানীয় জলাশয়ে ছেড়ে দেয়। যেহেতু এরা প্রতিকূল পরিবেশে দারুণ অভিযোজিত হতে পারে তাই এরা জলাশয়ে দিব্যি বেঁচে থাকে। পুকুর, খাল-বিল, হ্রদ বা নদীর স্বাভাবিক মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীদের নির্বিচারে খেয়ে ফেলে জলজ বাস্তুতন্ত্রের দফারফা করে দেয়। অ্যাকোয়ারিয়ামে চাষের জন্য যেসব প্রজননকেন্দ্রের জলাশয়ে এই মাছের বাচ্চা চাষ করা হয় সেখানে যদি বন্যা হয়ে যায় তবে সহজেই এই মাছ বিপুল পরিমাণে জলজ পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা। কিছুদিন আগে কেরালায় ভয়াবহ বন্যার সময় এই ঘটনা ঘটেছে।

শুধু অ্যালিগেটর গার নয়, একই দোষে দুষ্ট আরও কিছু বিদেশি মাছ, যেমন তেলাপিয়া, রূপচাঁদা, আফ্রিকান মাগুর ইত্যাদি। আফ্রিকার স্বাভাবিক মাছ তেলাপিয়া, দক্ষিণ আমেরিকায় স্বাভাবিক মাছ রূপচাঁদা (Red bellied pacu) বা আফ্রিকান মাগুর যদিও খাদ্য হিসেবে বর্তমানে আমাদের দেশে চাষ হচ্ছে কিন্তু এগুলো বন্যার সময় চাষের পুকুর থেকে নদী-খাল-হ্রদ ইত্যাদিতে সহজেই চলে যাচ্ছে এবং তারপর ওইসব জলাশয়ের স্বাভাবিক বাস্তুতন্ত্রকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। এর প্রমাণও আমরা পাচ্ছি। আগে গঙ্গায় যে পরিমাণ স্বাভাবিক মাছ

আফ্রিকান মাগুর

পাওয়া যেত এখন তার অধিকাংশই পাওয়া যায় না। বরং পাওয়া যায় ওইসব বহিরাগত মাছের প্রজাতি।

তাহলে এই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কী? উপায় তো আইনেই বলা আছে। জীববৈচিত্র্য আইন (২০০২) অনুসারে পরিবেশের পক্ষে বিপজ্জনক কোনও বিদেশি প্রজাতিকে দেশের মধ্যে আনা বা প্রতিপালন করা দন্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু আইনের রক্ষকরা যদি চোখ বুজে থাকেন তবে পরিবেশ রক্ষা পাবে কী করে? শুধু অ্যালিগেটর গার নয়, পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকর সমস্ত বিদেশি প্রজাতির মাছের চাষ দ্রুত বন্ধ করার জন্য সরকারকে জরুরী ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি পরিবেশে বিদেশি প্রজাতির মাছের ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতাও গড়ে তুলতে হবে। পরিবেশ রক্ষা পেলে তবেই না আমরা বেঁচে থাকব।

লেখক বিজ্ঞানের শিক্ষক, বিজ্ঞানকর্মী ও প্রাবন্ধিক
email: janasoumyakanti@gmail.com • M. 9064202882, 9434570130

পল্লব রায়গুপ্ত

সৃষ্টি ও ধ্বংসের নেপথ্যে

যে মহাবিশ্বের আমরা একটা ছোট্ট অংশ, তার সৃষ্টি সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল অনন্ত। সৃষ্টি থাকলে তার অন্ত থাকবে এই অমোঘ সত্যকে আমরা অনেক সময়েই ভুলে যাই বা আগ্রহ প্রকাশ করিনা। হয়তো শেষের দিনের চিন্তা আমাদের আতঙ্কিত করে তোলে আর তাই আমরা সেই চিন্তা থেকেই নিজেদের সরিয়ে নিই। বিজ্ঞান কিন্তু সৃষ্টি ও ধ্বংস দুটির ব্যাপারেই সমান আগ্রহী। সম্ভাব্য যেকোনো বিপর্যয়ের সাথে যুঝবার জন্য বিজ্ঞানীরা নিজেদের প্রস্তুত করে চলেছেন অনবরত।

এমন একটা দিন আসতেই পারে, যেদিন সমগ্র পৃথিবী বেশ কিছু সময়ের জন্য আদিম হয়ে পড়বে। ইলেকট্রিসিটি বন্ধ, ইন্টারনেট কাজ করবেনা, সমস্ত অর্থনৈতিক লেনদেন বিপর্যস্ত হবে। শুনে কিছুটা কল্পবিজ্ঞানের গল্প মনে হলেও বাস্তবে এই পরিস্থিতি আসতেই পারে। আর এই রকমটা হতে পারে শুধু মাত্র সূর্যে কিছু ঘটনা ঘটার জন্য। পৃথিবীর সৃষ্টি ও ধ্বংসের চাবিকাঠি নিহিত আছে সূর্যের মধ্যে। সূর্য তার সৌর পরিবারের প্রধান কর্তা। এটি একটি গ্যাসের বিশাল একটি গোলা। তার মধ্যে অনবরত চলছে এক পরিবর্তনের খেলা। দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু মিশে গিয়ে তৈরী হচ্ছে এক নতুন পরমাণু হিলিয়াম আর তার সাথে প্রচুর এনার্জি যা ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলে ফিউশন। পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টির মূল হলো সূর্য থেকে উদ্ভূত সেই এনার্জি। শুধুই কি এনার্জি যথেষ্ট নাকি দরকার সঠিক পরিবেশ? এই সব প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে আমাদের অতি পরিচিত নক্ষত্রের কাছে।

এক ভয়ঙ্কর তাপমাত্রায় সূর্যের মধ্যের পদার্থ প্লাজমা অবস্থায় থাকে। এই প্লাজমা কখনো কখনো দুর্বার গতিতে এক ঘূর্ণি ঝড়ের সৃষ্টি করে। পৃথিবীতে বসে টেলিস্কোপ এ চোখ রেখে বিজ্ঞানীরা এই সৌর ঝড়ের ছবি তুলতে সক্ষম হন। সূর্যের গায়ে এই ঝড় কালো কালো গর্তের মতো দেখায়। প্রতিবেশী রাষ্ট্র বা রাজ্যের কোনো ঘটনা যেমন তার আশপাশের রাষ্ট্রে বা রাজ্যে প্রভাব ফেলে তেমনি সৌর ঝড়ের প্রভাব পৃথিবীতে ডেকে আনতে পারে এক তাণ্ডব লীলা।

গত মাসের এক ঘটনা সেই তাণ্ডবের এক ছোট নিদর্শন মাত্র। প্রখ্যাত উদ্যোক্তা এলোন মাস্ক-এর স্বপ্নের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা স্পেসএক্স এর প্রায় পঞ্চাশটি উপগ্রহ উৎক্ষেপণের কিছুক্ষণের মধ্যেই ধ্বংস হয়ে যায়। ঠিক কি ঘটে এই সৌর ঝড় হলে? সূর্যের দেহ থেকে ফোয়ারার মতো ছুটে আসে রাশি রাশি চার্জড পার্টিকেল বা তড়িতাহিত কণা। সেই সব কণার সংস্পর্শে মহাকাশ স্থিত কোনো ধাতব বস্তুর বিভব যায় বেড়ে। এই ভয়ঙ্কর বিভবের জন্যে ধাতব উপগ্রহগুলিতে বিস্তর গোলোযোগ বাধে। তাহলে এ সমস্ত চার্জড পার্টিকেল যখন পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়ে, তার আগে পৃথিবী তার নিজস্ব সুরক্ষা বলয় অর্থাৎ চুম্বক ক্ষেত্রের সাহায্যে এই আক্রমণকে কিছুটা আটকাতে সক্ষম হয়। কিন্তু যদি সৌর ঝড়ের তীব্রতা অনেক বেশি থাকে তাহলে সেটি ডেকে আনতে পারে ঘোর বিপর্যয়। এই সমস্ত চার্জড পার্টিকেল পৃথিবীতে থাকা ইলেকট্রিক গ্রিড গুলির বিভব সাংঘাতিক রকম বাড়িয়ে দেয়।

ফলস্বরূপ যেকোনো ইলেক্ট্রিক্যাল সামগ্রী তৎক্ষণাৎ পুড়ে ছাই হয়। মহাকাশে ঘূর্ণায়মান উপগ্রহগুলি যদি বিকল হয়ে পড়ে তাহলে পৃথিবীর সমস্ত বৈদ্যুতিন যোগাযোগ মাধ্যমও বিকল হয়ে পড়ে। বর্তমান সভ্যতার একটি বড় অংশীদার হল ইন্টারনেট, টিভি ও রেডিও। এগুলির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জুড়ে আছে দেশের ব্যাঙ্কিং, গবেষণা, সরকারি ও বেসরকারি কাজ এবং বিনোদন। একটি বড়ো সৌর ঝড় যদি আছড়ে পড়ে তাহলে তা কোনো একটি দেশের আর্থ সামাজিক ব্যবস্থা তছনছ করে দেওয়ার জন্যে যথেষ্ট। হিসেব করে দেখা গেছে এই আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ট্রিলিয়ন ডলার ও ছাড়িয়ে যেতে পারে। সৌর ঝড়ের সরাসরি প্রভাব এসে পড়ে প্রত্যেক দিনের আবহাওয়াতেও। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে খরা ও বন্যার প্রবণতা বেড়ে যায়। দীর্ঘস্থায়ী অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি পৃথিবীকে দাঁড় করাতে পারে ধ্বংসের মুখোমুখি।

আমরা কি এতটাই অসহায়? বিজ্ঞান কি আমাদের কোনো পথ দেখাতে পারে? কলকাতার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এডুকেশন এন্ড রিসার্চ-এ গড়ে উঠেছে মহাকাশ সংক্রান্ত গবেষণার একটি বিশেষ কেন্দ্র। সেখানকার বিজ্ঞানী ডঃ দিব্যেন্দু নন্দী একজন সৌর বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ। তার আবিষ্কৃত মডেল ভারতবর্ষের মহাকাশীয় আবহাওয়া সংক্রান্ত গবেষণাকে এক নতুন পথ দেখাচ্ছে। সেই মডেলের সাহায্যে আগামী এক দশক ধরে সূর্যের প্লাজমার গতিবিধির পূর্বাভাস ও পর্যালোচনা করা সম্ভব। যেকোনো রকমের সৌর ঝড়ের আগাম আভাস পেলে তার জন্যে তৈরী থাকা সম্ভব হয় এবং সে ক্ষেত্রে ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ অনেকাংশে কম করা সম্ভব। মূলত তাঁরই প্রচেষ্টাতে আমাদের দেশ আরেকটি মহাকাশ অভিযানের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে।

আদিত্য এল-১ নামের এই মহাকাশ অভিযানের মূল উদ্দেশ্য হল সূয্যি মামার ঘরের হাঁড়ির খবর নেওয়া এবং সে সব তথ্য সৌর বিজ্ঞান গবেষণার অমূল্য সম্পদ হয়ে উঠবে। এতদিন পর্যন্ত আমাদের দেশকে এইসব তথ্যের জন্য নাসা-র কাছে হাত পাততে হত। এই অভিযান আমাদের দেশকে সৌর গবেষণায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলবে।

কয়েক কোটি বছর আগে যেমন সূর্য ও বিভিন্ন নক্ষত্রের দেহাবশেষ থেকে পৃথিবীতে প্রাণের স্পন্দন জেগেছিলো ঠিক তেমনি ভাবে একটি সৌর ঝড় পৃথিবীতে কোনো একটি সভ্যতা মুছে দিতে পারে। এই প্রাণের সৃষ্টি ও ধ্বংসের লীলা খেলায় আমরা এখনো সূর্যের কাছে বন্দি।

লেখক বিজ্ঞান লেখক, আই আই টি, মাদ্রাজ।

email: physics.pallab@gmail.com • M. 9681021007

৫ জুন বিভিন্ন অনুষ্ঠান

বিশ্ব পরিবেশ দিবস

আয়োজক : জে এস এন সি, জলপাইগুড়ি
অনুষ্ঠান : আলোচনা, পুরস্কার বিতরণ, পদযাত্রা, গাছ বিতরণ

আয়োজক : বিজ্ঞান দরবার ও ভারত স্কাউটস ও গাইডস শীতলাপাড়া
অনুষ্ঠান : সাইকেল র‍্যালি, চিত্র প্রদর্শনী ও পথসভা

আয়োজক : খোয়ারডাঙ্গা গবেষণা পরিষদ
অনুষ্ঠান : পদযাত্রা

আয়োজক : জি ই সি ও, কোচবিহার
অনুষ্ঠান : পদযাত্রা

আয়োজক : এস সি এফ, কলকাতা
অনুষ্ঠান : চিত্রাঙ্কন, বৃক্ষরোপণ, গাছ বিতরণ

আয়োজক : নদীয়া পরিবেশ মঞ্চ ও শান্তিপুর সায়েন্স ক্লাব
অনুষ্ঠান : আলোচনা, প্রদর্শনী ও পত্রিকা প্রকাশ

আয়োজক : পি এ এস ই, কলকাতা
অনুষ্ঠান : বৃক্ষরোপণ, সম্মেলন, প্রদর্শনী

আয়োজক : খেলাঘর, মসলগ্রাম
অনুষ্ঠান : বৃক্ষরোপণ, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড

আয়োজক : নেচার ফার্স্ট, রাণাঘাট
অনুষ্ঠান : প্রদর্শনী, আলোচনা, পত্রিকা-প্রকাশ

আয়োজক : পি এস ফাউন্ডেশন, পূর্ব মেদিনীপুর
অনুষ্ঠান : বৃক্ষরোপণ

আয়োজক : নৈহাটি নাগরিক উদ্যোগ
অনুষ্ঠান : পদযাত্রা

আয়োজক : সহকার, মালদা
অনুষ্ঠান : পদযাত্রা, আলোচনা

আয়োজক : সবুজের অভিযান, চন্দননগর
অনুষ্ঠান : আলোচনা ও প্রদর্শনী

আয়োজক : পরিবেশ বান্ধব মঞ্চ, ব্যারাকপুর
অনুষ্ঠান : আলোচনা

আয়োজক : বিজ্ঞান ভাবনা, মুর্শিদাবাদ
অনুষ্ঠান : গাছ বিতরণ, পথসভা

আয়োজক : শিশারী সংকল্প ও উড়ান, দঃ দিনাজপুর
অনুষ্ঠান : পদযাত্রা, সাইকেল র‍্যালি, পোস্টার প্রদর্শনী

আয়োজক : যৌথ পরিবেশ মঞ্চ, হাওড়া
অনুষ্ঠান : পদযাত্রা, আলোচনা

আয়োজক : ডোমকল বিজ্ঞান পরিষদ, মুর্শিদাবাদ
অনুষ্ঠান : পথসভা, প্রদর্শনী

BIGYAN ANNESWAK VOL : 19 Issue No. 4 July-August 2022 RNI : WBBEN/2003/11192 Rs. 20-
ISSN 2582-5674

রাজা রাউত

যারা হারিয়ে যাচ্ছে

স্তন্যপায়ী **তুষার চিতা**
সাধারণ ইংরেজি নাম: *Snow Leopard*
বিজ্ঞানসম্মত নাম: *Panthera uncia*

মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে অত্যন্ত দুর্লভ এই স্তন্যপায়ী পাওয়া যায়। এটি এতটাই দুর্লভ যে প্রাণীবিদরা একে 'পাহাড়ী ভূত'—আখ্যা দিয়েছেন। সারা বিশ্বে আনুমানিক দশ হাজারের মত সংখ্যায় বেঁচে আছে বলে মনে করা হয়। ২০১৬ সালের এক সমীক্ষা অনুসারে ভারতের ভূখণ্ডে আনুমানিক ৫১৬-৫২৪টি সংখ্যায় রয়েছে বলে অনুমান। ভারতে প্রধানত হেমিস জাতীয় উদ্যান, কিস্তওয়ার জাতীয় উদ্যান, দাচিগাম জাতীয় উদ্যান প্রভৃতি বনাঞ্চলে দেখা যায়।

সরীসৃপ **মগর**
সাধারণ ইংরেজি নাম: *Muggar Crocodile/Mars Crocodile*
বিজ্ঞানসম্মত নাম: *Crocodylus palustris*

এটি মধ্যম আকারের সুপেয় জলের প্রাচীন কুমির। দক্ষিণ ইরান থেকে শুরু করে ভারতীয় উপমহাদেশে এদের দেখা যায়। এদের প্রাকৃতিক আবাসস্থল ধ্বংস, মাছ ধরার জালে আটকে পড়ে এবং মানুষের সঙ্গে সংঘাতের ফলে এদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমে আসছে। IUCN এর রেড ডাটাবুক অনুসারে এরা বিপন্নপ্রায় প্রজাতি। মূলত জলাভূমি, হ্রদ, নদী এবং পুকুর প্রভৃতি অঞ্চলে এরা বসবাস করে। বর্তমানে এইসব আবাসস্থল বিলুপ্তির পথে।

পক্ষী **হিমালয়ের কোয়েল**
সাধারণ ইংরেজি নাম: *Himalayan Quail*
বিজ্ঞানসম্মত নাম: *Ophrysia superciliosa*

এটি মধ্যম আকারের তিতির জাতীয় পাহাড়ী পাখি। ১৮৪৫ সালে আবিষ্কৃত হয় এবং ১৮৭৬ সালের পর আর রেকর্ড করা যায়নি। উত্তরাখণ্ডের পশ্চিম হিমালয়ের মূলত দুটি অঞ্চলে পাওয়া যেত। শেষ দেখা গেছে মুসৌরি নিকটবর্তী অঞ্চলে। মতানৈক্য থাকলেও বিজ্ঞানীদের মতে বর্তমানে তীব্রভাবে সংকটাপন্ন প্রজাতি রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে ২০১৫ সাল থেকে। একসময় মনে করা হত এটা লুপ্ত প্রজাতি। কিন্তু ২০১৫ সাল থেকে কোন কোন এলাকায় এদের দেখার দাবি উঠেছে। তাই এদের লুপ্ত না ধরে তীব্র সংকটাপন্ন মনে করা হচ্ছে।

অমেরুদণ্ডী **রাজকাঁকড়া**
সাধারণ ইংরেজি নাম: *Horseshoe Crab/King Crab*
বিজ্ঞানসম্মত নাম: *Limulus sp.*

অত্যন্ত প্রাচীন কালের এই রাজকাঁকড়া অগভীর সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলের নরম বালি কিংবা কর্দমাক্ত অঞ্চলে দেখা যায়। এই প্রাণীটিকে জীববিদ্যার পরিভাষায় জীবন্ত জীবাশ্ম বলা হয়। এরা চিকিৎসাবিজ্ঞানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—বিশেষ করে এদের রক্তে উপস্থিত বিশেষ উপাদান 'LAL (Limulus Amaebocyte Lysate) এর উপস্থিতির জন্য। ভারতের উপকূলবর্তী অঞ্চলে বিশেষ করে বঙ্গোপসাগরীয় উপকূলবর্তী অঞ্চলে দেখা যায়। আজ এরা বিপন্নপ্রায় প্রজাতি রূপে চিহ্নিত।

email:rajaroutbbbb1@gmail.com • M. 9474417178